২০০৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক জামিয়া হাফসা ও লাল মসজিদে ভয়াবহ হামলার ইতিবৃত্ত

রক্তাক্ত লাল মসজিদ

ভাষান্তর

শাহেদ রাহমানী

মারকাযুস সুন্নাহ ওয়ালইরশাদ কুমিল্লা

২০০৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক জামিয়া হাফসা ও লাল মসজিদে ভয়াবহ হামলার ইতিবৃত্ত

রক্তাক্ত লাল মসজিদ

যেভাবে কেটেছে আমাদের দিনগুলো

উম্মুশ শুহাদা মুহতারামা উম্মে হাসসান

প্রিন্সিপাল: জামিয়া হাফসা রা. ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

ভাষান্তর

শাহেদ রাহমানী

মারকাযুস সুন্নাহ ওয়ালইরশাদ কুমিল্লা

উৎসর্গ

লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসায় শহীদ হওয়া জান্নাতের সবুজ পাখিদেরকে এবং আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মাকে যাদের দোয়া ও ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইলমে দ্বীনের আলোয় আলোকিত করেছেন।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	১
প্রারম্ভিকা	৫
কীভাবে বর্ণনা দিব ভয়াবহ এই ট্রাজেডির	৭
আব্বাজানকে শহীদ হতে দেখেছি	৯
মেয়েদের প্রতিবাদ	১১
আমাদের সাথে রসিকতা করা হয়েছে	১৩
লাল মসজিদ সকল ধর্মীয় আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল	১৪
গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছে	১৬
আমরা মোটেও সংঘাত চাইনি	২২
মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের গ্রেফতার	২৩
ভুলতে পরিনি সেই ৭টি দিনের কথা	২৪
আমরা আল্লাহ তাআলার খুব নিকটবর্তী	২৭
আল্লাহ তাআলার নুসরাত	২৯
আম্মীজানের ঈমানী জযবা	৩২
হৃদয় বিদারক দৃশ্য	৩৪
গৌরবান্বিত শহীদদের প্রতি সালাম	৩৫
লাল মসজিদ ট্রাজেডি	৩৬
সমালোচনা নয় পর্যালোচনা	৩৮
হয়ত চাদর নয়ত কাফন	৪০
আমাদের উপর যা ঘটেছিল	৪৪
ওসিয়তনামা	৪৮

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীজুড়ে আজ মুসলমানরা নির্যাতিত, নিপীড়িত। প্রতিনিয়ত বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম শিশুদের দেহ। চূর্ণ-বিচূর্ণ তাদের আবাসস্থলগুলো। লুণ্ঠিত মুসলিম মা-বোনদের পবিত্র সম্ভ্রম। ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও কাশ্মির থেকে শুরু করে এভাবেই জালিমের জুলুম ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সকল মুসলিম ভূখন্ডে। ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু বড়ই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলিমরা এখনো পরস্পর মতানৈক্য ও অনৈক্যের বেড়াজালে আটকে আছে। মাজলুম মুসলিমদের আর্তনাদে সাড়া না দিয়ে উম্মাহর যুবকরা দুনিয়ার মোহে পড়ে আছে। অর্থ-সম্পদের নেশায় ডুবে আছে। ওই দিকে পশ্চিমারা সুপরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে কিন্ত মুসলমানরা ইসলাম রক্ষার কর্মপদ্ধতী ভুলে গিয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহর বিষয়ে চরম উদাসীনতা ও অবহেলা করতে কোনরুপ কসরত করেনি।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমারা ক্রমাগত মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েছে। ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়গুলো অবমাননা করতে উঠে পড়ে লেগেছে। মুসলমানরা যখন এসব সহজেই সহ্য করে নেয়, নিজেদের হাত গুটিয়ে বসে থাকে, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর মত ফরজ বিধানকে উপেক্ষা করে চলে। তখন পশ্চিমারা সুপরিকল্পিতভাবে লড়ে যাওয়ার সাহস পায়। নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য রাতের অন্ধকারে মুসলিম জনপদগুলোতে আক্রমন চালায়। রাতারাতি লাখ লাখ মুসলিমকে শহীদ করে মুসলিম ভূখন্ডগুলোকে তছনছ করে ফেলে। শুধু তাই নয় বরং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্টুন তৈরি করে মিডিয়ায় প্রচার করে (নাউযুবিল্লাহ) এবং প্রিয় নবী মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুসলমানদের ভালোবাসা ও ভক্তি পরীক্ষা করে।

সারা বিশ্বের মুসলমানরা, বিশেষ করে পাকিস্তানের মুসলমানরা যখন এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের

অগাধ ভালোবাসা, ভক্তি ও আবেগপ্রবণতা প্রদর্শন করে, তখন পাশ্চাত্যের প্রতিশোধের আগুন আরো প্রজ্জ্বলিত হয় এবং তারা তাদের পালিত কুকুরদেরকে মুসলমানদের ভালোবাসা ও ভক্তির কেন্দ্রসমূহে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়। ফলে তারা মুসলমানদের মসজিদ ও মাদরাসাগুলো ভেঙ্গে ফেলার প্রজ্ঞাপন জারি করে। কওমী মাদরাসাগুলোকে সরকারী হেফাজতে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। তাদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের উপর জোর দেয়। মডেল মাদরসার নামে কওমী মাদরাসাগুলোকে ধ্বংস ও নিস্তেজ করার লক্ষে পশ্চিমাদের পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে।

কিন্তু তাতেও তাগুতের দোষর মুসলিম শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমা স্যেকুলারদের খুশি করতে পারেনি। অবশেষে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ এবং মাদরাসাগুলোকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের আস্তানার তকমা দিয়ে তাতে বোমা বর্ষণ শুরু করে। কিংবা বুল্ডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। এভাবে সারা বিশ্বে আলেম-উলামা ও ছাত্রজনতার পবিত্র রক্তে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো রক্তাক্ত করে। মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য বিনষ্ট করতে এবং তাদের ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

এত কিছুর পরেও, পশ্চিমারা প্রকৃত অর্থে মুসলিম শাসকদের প্রতি খুশি ও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাদের চাহিদা পূরণ হয়নি, কারণ তারা চায় উলামায়ে কেরামগণ এবং মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অসম্মানিত হোক, লোকেরা তাদের ঘৃণা করুক এবং তাদের উপর মুসলমানদের আস্থা হারিয়ে যাক। পৃথিবী থেকে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হোক। নিঃসন্দেহে শুরু থেকেই তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এমনই ছিল, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আজ পর্যন্ত তারা এতে সফল হতে পারেনি।

তবে তারা তাতে দমে যায়নি বরং তারা তাদের পাঁ-চাটা গোলাম শাসকদেরকে মাদরাসা ও মসজিদের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। তাই ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া মুসলমানদের দেশ, মুসলিম জনসংখ্যার শহর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তৎকালীন তাগুত সরকার পারভেজ মোশাররফ মসজিদ ভাঙ্গার মত জগন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একে একে সাতটি মসজিদ শহীদ করে দেয়। পাকিস্তানের মুসলমান,

৩

রক্তাক্ত লাল মসজিদ

ধর্মপ্রাণ মানুষ ও উলামায়ে কেরাম এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানালেও স্বৈরাচার সরকার পারভেজ মোশাররফ তা আমলে নেইনি। ফলে ইসলামাবাদে অবস্থিত ঐতিহাসিক লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসা এর সম্মানিত খতিব মাওলানা আবদুল আজিজ রহ. এবং তার সহকারী মাওলানা আবদুল রশিদ গাজী ও অন্যান্য আলেমরা এর প্রতিবাদ ও জোর দাবি জানিয়েছেন যে, ভেঙে ফেলা সাতটি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো মসজিদ ভাঙা হবে না বলে আশ্বাস দিতে হবে।

কিন্তু এতেও সরকার কোনরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, তাই তারা লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসা সংলগ্ন গ্রন্থাগারে অবস্থান নেয়। যেন তারা তাদের ন্যায্য দাবি পূরণের কারণ এবং উপায় হিসাবে এটিকে ব্যবহার করতে পারে। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. সকল ভয় ও বাধা উপেক্ষা করে তাগুতি শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে এবং শরিয়া প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আওয়াজ তুলেন। এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র মসজিদ পুনঃনির্মাণের দাবিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং সেটাকে সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছেন।

২০০৭ সালের ১০ই জুলাই পাকিস্তানে রচিত হয় এক কলঙ্কিত অধ্যায়। ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া মুসলিম ভূখণ্ডে উন্মোচিত হয় বেদনাময় ইতিহাস। আজ থেকেও একযুগ পূর্বে পশ্চিমাদের পদলেহিত তৎকালীন পাকিস্তানের কুখ্যাত স্বৈরাচার সরকার পারভেজ মোশাররফ ইসলামাদ শহরে অবস্থিত জামিয়া হাফসা ও লাল মসজিদে অবস্থানরত উলামায়ে কেরাম ও নিরাপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নারকীয় গণহত্যা পরিচালনা করে। পাকিস্তানের ইতিহাসে এমন বর্বরতার কথা ইতিপূর্বে কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। সেদিন শিক্ষার্থীদের আর্তচিৎকারে জামিয়া হাফসার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে যায়। মুহুর্মুহু গুলির শব্দে ইসলামাদের দালানগুলো প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। জামিয়া হাফসা ও লাল মসজিদের দেয়ালগুলো বোমার আঘাতে ধ্বসে পড়ে। কুরআন ও হাদীসের কিতাবাদী বোমার আগুনে জ্বলসে যায়। বর্বরোচিত এই গণহত্যায় লাল মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলান আব্দুর রশিদ গাজী রহ.

সহ শত শত ছাত্র-ছাত্রী শাহাদাত বরণ করে এবং শত শত তালিবুল ইলমকে গ্রেফতার হয়। সপ্তাহব্যাপী নারকীয় গণহত্যা শেষে মুসলিমদের টাকায় কেনা অস্ত্র মুসলিমদের বিপক্ষে ব্যবহার করে পাকিস্তান সরকার লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসা দখল করে নেয়।

এই ছোট্র রিসালাটিতে ইসলামাবাদের সেই বেদনাদায়ক ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। যা প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিবে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এবং নিজেদের হারানো গৌরব ও সম্মান ফিরে পেতে আমাদের ভুলে যাওয়া কর্মপদ্ধতী স্মরণ করিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ!

কিতাবটি মূলত উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছে। যার মূল নাম হলো **"হাম পর কিয়া গুজরী"** বইটি আমি যতবার পড়েছি ততবার শিহরিত হয়েছি। অশ্রুসিক্ত হয়েছি। প্রতিটি ঘটনা আমার অন্তরকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কলিজায় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে।

আমি আমার অজ্ঞতা, যোগ্যতা ও সাধ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনবহিত নই। তবুও চেষ্টা করেছি সুন্দর সাবলিল অনুবাদে সুখপাঠ্য করার। নিজস্ব ভঙ্গিতে সাজাবার। সফল হয়েছি কিনা জানিনা। তবে এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছিনা। কারণ, আরো কিছু কাজ করার ইচ্ছা আমার রয়েছে। ইনশাআল্লাহ!

অনুবাদের দিক দিয়ে এটি আমার প্রথম বই। তাই লেখালেখির সূচনা প্রেরণা ও পরিচর্চার ক্ষেত্রে জীবনে যেখানেই যার কাছে যেভাবে উপকৃত হয়েছি, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে সর্ব প্রথম উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে যিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন, তিনি সকলের পরিচিত বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক **মাওলানা এনামুল হক মাসউদ হাফি.**। তার আশা জাগানিয়া উৎসাহ ও সুপরামর্শ আমাকে ভীষণ উজ্জীবিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থ ও স্বস্তিতে রাখুন।

পরিশেষে সকলের নিকট দোয়া চাই, মহান রাব্বুল আলামীন যেন বইটি ও বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কবুল করেন। আমীন

শাহেদরাহমানী

প্রারম্ভিকা

হযরত খাওলা ও হযরত খানসা রা. এর জিহাদী কৃতিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া এক সাহসী ও স্বাধীনতাকামী, পবিত্রতা ও আত্মসম্ভ্রমের অধিকারীর কথা। আমাদের সেরেতাজ উম্মুশ শুহাদা মুহতারামা উম্মে হাসসান ইতিহাসের অবিস্মরণীয় এবং অতুলনীয় এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। জামিয়া হাফসার বিরুদ্ধে অপারেশন চলাকালীন তিনি সাহসিকতা ও হিম্মতের সাথে যে কঠিন সময় অতিবাহিত করেছেন, তা ইতিহাস কখনো ভুলতে পারবেনা। তিনি স্নেহ ও মমতার উজ্জল নক্ষত্র। হাজার হাজার অভিভাবকহীন এবং অসহায় বাচ্চাদের আশ্রয়স্থল। তিনি শীতল ঝর্ণার ন্যায় হৃদয়ের প্রশান্তি। ছাত্রীরা তাঁকে ভালোবেসে, আপন ভেবে "আপ্পীজান" বলে ডাকতো। মাওলানা আব্দুল্লাহ শহীদ রহ. এর সম্মানিত পরিবারের সদস্য হওয়ায় উম্মে হাসসানের মুজাহাদা এবং কুরবানী একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের সাহচর্য তার ব্যক্তিত্বকে ইখলাস, খোদাভীরুতা, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের গুনে গুনান্বিত করল। তিনি মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের সাথে মিলে মুসলিম মহিলা ও মুসলিম মেয়েদের জন্য পূর্ণ পর্দার সাথে দ্বীনি পরিবেশ তৈরী করতে, দ্বীনের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে এবং ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করতে জামিয়া হাফসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব এবং মুহতারামা উম্মে হাসসানের ইখলাস, দুআ এবং রাত-দিন মেহনতের ফলে স্বল্পসময়ের মধ্যে ছোট একটি মাদরাসা পুরা ইসলামী বিশ্বে দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার একটি বড় মারকায হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। একটু একটু করে তারা উম্মাহর অসহায় মেয়েদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল নির্মাণ করলেন। বছরের পর বছর কষ্ট করার পর যখন শান্তি ও সুখের দিন শুরু হলো, তখন তারা মসজিদ রক্ষায়, দ্বীনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, শরীয়া প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের আরাম আয়েশ ত্যাগ করে নিজের বংশ মর্যাদাকে মিটিয়ে দিলেন এবং নিজেদের মাদরাসার কুরবানী পেশ করে দৃঢ় সংকল্পের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। লাল মসজিদ ট্রাজেডিতে শাহাদাত বরণকারীগণ তো চিরদিনের জন্য সুখ ও শান্তি লাভ করেছে। কিন্তু লাল মসজিদ ট্রাজেডির বিভিষিকা জীবিতদের সকল সুখ ও শান্তি কেড়ে নিয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই বর্বরতা ও পৈশাচিকতার বিপরীতে

৬

রক্তাক্ত লাল মসজিদ

মুহতারামা উম্মে হাসসান সাহসিকতার যে নজরানা পেশ করেছেন তার প্রশংসা করতেই হয়। তার কলিজা কতটা মজবুত তা বুঝার জন্য তার উপর লাল মসজিদ ট্রাজেডির সময় কি হয়েছে? তা জানতে হবে। সাত দিন ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, বোমা বর্ষণের ভয়ংকর আওয়াজ, মূহুর্মূহু গুলি, টিয়ারশেলের ধোঁয়ার যন্ত্রণা, লাশের সারি, ছেলে মেয়েদের একের পর এক শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য, ছাত্র ছাত্রীদের প্রবাহিত রক্ত, ছিন্ন ভিন্ন হওয়া গোশতের টুকরো, আগুনের লেলিহান শিখা, ব্যাথায় কাতরানো আহত ছাত্রীদের আহাজারী, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছেলে মেয়েদের আর্তনাদ, কুরআনুল কারীমের পুড়ে যাওয়া পাতা, শহীদ হয়ে যাওয়া হাদীসের কিতাবাদী, গুলির আঘাতে ঝাঝরা হয়ে যাওয়া মসজিদের দেয়াল ইত্যাদির দৃশ্য দেখে নয় বরং কল্পনা করেও মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু উম্মে হাসসান স্বাভাবিকই ছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি ধৈর্য ও সাহসিকতার এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

গ্রেফতার, ধর-পাকড়, তল্লাসীর কঠিন পরিস্থিতি, যুবক বয়সের একমাত্র ছেলের শাহাদাত, সারা জীবনের কষ্ট-সাধনায় নির্মিত জামিয়া হাফসাকে গুড়িয়ে শহীদ করে দেয়া, মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের মুক্তি, মামলা-মুকাদ্দামার বিষয়ে অস্থিরতা, কোর্ট-কাচারীর পেরেশানী, নিজেদের নেতৃত্ব, মাদরাসা পরিচালনার জিম্মাদারী ইত্যাদি বিষয়ে তাকে একসাথে সামাল দিতে হয়েছে। অন্য কেউ হলে চিৎকার দিয়ে বলত–

এটি জীবন নাকি কোন ঝড়-তুফানের ঢেউ,
আমরা তো বেচে থেকেও মরে গেছি খোজ নেইনি কেউ।

কিন্তু মুহতারামা উম্মে হাসসান এখনো ধৈর্য, সন্তুষ্টি, দৃঢ়তা ও ঈমানের এক বাতির ন্যায় আলো বিতরণ করছেন। তার সাক্ষাতে ঈমান নবায়ন হয়। তার আলোচনা জজবাকে উজ্জীবিত করে। তার জীবনী সকলকে মুগ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানী জজবাকে অটুট রাখুক। তার কুরবানীকে উত্তমরূপে কবুল করুক। তার ছেলে-মেয়ে, পূর্বপুরুষ এবং মাদরাসার এই ত্যাগকে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করুক। আমীন।

কীভাবে বর্ণনা দিব ভয়াবহ এই ট্রাজেডির !

লাল মসজিদ ট্রাজেডির ভয়াবহতার ক্ষত আমার অন্তরের গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য, অসহায়ত্বের মূহুর্ত এবং সেই দুঃখের গল্পটা যখনই কল্পনা করি তখনই হৃদয় থেকে বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। আলোচনা করতেই কলিজাটা যেন বের হয়ে আসে। লেখতে বসলেই হাত অবশ হয়ে আসে। বুঝতে পারছিনা সহিংসতা, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার বর্ণনা কোথা থেকে, কিভাবে শুরু কররর! নিজেদের জুলুম-নির্যাতনের বর্ণনা করব নাকি অন্যদের নিপীড়নের সমালোচনা করব! লাল মসজিদের শহীদদের সাহসিকতা ও বীরত্বকে শুভেচ্ছা জানাবো নাকি মুসলিম উম্মাহর উদাসীনতা ও অসহায়ত্বের বর্ণনা দিব! গাজী ভাইয়ের উজ্জল ব্যক্তিত্বের শোকগাঁথা গল্প বলব নাকি ফুলের ন্যায় শিশুদের বিচ্ছেদের গল্প লিখব! গুলির আঘাতে লাল মসজিদের ঝাঝরা হওয়া দেয়ালের বর্ণনা দিব নাকি জ্বলে যাওয়া কুরআনের পাতার কথা বলব! এগুলো এমন কিছু প্রশ্ন যা আমাকে অদ্ভূত দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে ।

আমি আমার জীবন সেদিন থেকেই পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য উৎসর্গ করেছি, যেদিন মাওলানা আব্দুল্লাহ শহীদ রহ. এর পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ছোট থেকে আমি অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে লালিত পালিত হয়েছি। তবে এই ঘরে দ্বীনের জন্য নিজের সকল কিছুকে বিসর্জন দেয়ার এমন শিক্ষা পেয়েছি যে, হক্বের আওয়াজ বুলন্দ করতে এবং দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে নিজের সকল কিছুকে বাজি রাখার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। আমার সামনে মাওলানা আব্দুল্লাহ শহীদ রহ. কে গুলির আঘাতে ঝাঝরা করা হয়েছে। মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবকে হক্ব কথা বলার দরুন মিথ্যা মামলা দিয়ে আসামী করা হয়েছে। আমাদের মাদরাসার উপর দু'বার পুলিশ আক্রমন করেছে। আমাদের শত শত মেয়েদেরকে আহত করেছে। সহিংসতার টার্গেট বানানো হয়েছে আমাদেরকে। চার দেয়ালের পবিত্রতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। কিন্তু চলমান লাল মসজিদ ট্রাজেডি তো পূর্বেকার সকল কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে। সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। উফ, আল্লাহ! আমি তো কখনো কল্পনাও করিনি। শুধু আমি না, কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনো

শহর কূফা হয়ে যাবে আর তাতে কারবালা সৃষ্টি করা হবে। লাল মসজিদে কেয়ামতে সুগরা (ছোট কেয়ামত) কায়েম হওয়ার অনেকগুলো মৌলিক কারণ ছিল। যার শেষ মসজিদে আমীর হামযার শাহাদাতের মাধ্যমে হয়েছিল।

কালিমায়ে তাইয়্যিবার উপর প্রতিষ্ঠিত দেশে কালিমা পড়া মুসলমানদের উপর বহু নির্যাতন করা হয়েছে। মুসলমানদের পবিত্র ভূমিতে এমন কোনো জুলুম বাকি ছিলনা যা মুসলমানদের উপর করা হয়নি। কামাল আতাতুর্ককে আইডল বানিয়ে জ্ঞানার্জন এবং সাম্যের নামে বদদ্বীনি ও অশ্লীলতা সমাজে প্রচার করা হয়েছিল। কুরআনের আয়াত এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে শিক্ষা সিলিবাস থেকে বাদ দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধর্মহীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করা তো দূরে থাক, কেউ প্রতিবাদের আওয়াজ তোলারও সাহস করেনি। অশ্লিলতা ও নগ্নতার সয়লাব যুবকদের ঈমান ও জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু কেউ নিজেদের এই নতুন প্রজন্মকে বাচানোর কোনো চেষ্টা ও চিন্তা-ফিকির করেনি।

আদালতে ন্যায় ও ইনসাফ বিক্রি হতে লাগলো। সূদ খাওয়া গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। দুর্নীতিকে ক্ষমতায়নের লক্ষণ হিসাবে মনে করতে লাগলো। অসহায় দরিদ্র মানুষ জুলুম ও নির্যাতনে নিষ্পেষিত হতে লাগলো। ম্যারাথন প্রতিযোগীতার নামে লজ্জা শরমকে কবর দিয়ে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনাকে ছড়িয়ে দিল। নারী অধিকার সংরক্ষণের আড়ালে পাপাচার সংরক্ষণ করা হলো।

মাদরাসাগুলোতে তল্লাসী চালানো হয়েছে। উলামায়ে কেরামকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের কাঁধে অস্ত্র নিয়ে নিজেদের মুসলমান ভাইদেরকে শহীদ করা হয়েছে। আনন্দে মুখরিত এলাকাগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের নাগরিকদের ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে। তাদেরকে তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে। তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজন দ্বারে দ্বারে হোচট খেয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরেছে।

পাকিস্তানের শুভাকাঙ্খী ডাক্তার আব্দুল কাদের খানকে অযৌক্তিকভাবে বন্দি করা হয়েছে। আল্লাহর জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদদের জন্য সংকীর্ণ

করে দেয়া হয়েছে। পর্দাকে সেকেলের প্রতীক বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। জিহাদকে সন্ত্রাস বলা হয়েছে। এরপর পাকিস্তানে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর অসম্মানী করা শুরু হয়েছে। মসজিদ আল্লাহ তাআলার সম্মানের নিদর্শন। সেগুলোকেও শহীদ করা শুরু করেছে। ইসলামাবাদে একেরপর এক মসজিদকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

প্রতিটি মসজিদের শাহাদাত আমাদের অন্তরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করত। প্রেস কনফারেন্স, রেজুলেশন, সভা, মিটিং হতো। মিছিল বের হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ মসজিদগুলোর সংবাদ পত্রিকা থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত। মানুষ সকল কিছু ভুলে পুনরায় নিজেদের জীবন জীবিকার কাজে ব্যস্ত হয়ে যেত।

আর এদিকে এসব কিছু আমাদের ভিতর কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। চিন্তা করছিলাম এই বদদ্বীনি, বেহায়াপনা ও নগ্নতার সয়লাবের সামনে বাধা দেয়ার কোনো না কোনো উপায় বের করা উচিৎ।

ঐ বছরের শুরুতে আমাদের জামিয়া হাফসা রা. কে উপরন্থ পর্যায় থেকে নোটিশ দেয়া হয়েছে। এরপর ৮০টির উপরে উপরে মসজিদের একটি লিষ্ট প্রকাশিত হয়েছে যে, এই মসজিদগুলোকে শহীদ করে দেয়া হবে। মসজিদ মাদরাসাগুলোকে নিরাপত্তার ঝুকি বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

আব্বাজানকে শহীদ হতে দেখেছি

আল্লাহর ঘর এক স্বৈরাচার ও জালেম পারভেজ মোশাররফের মনগড়া এবং হঠকারিতার শিকার হয়েছে। ৮০ এর অধিক মসজিদকে শাহাদাতের নাপাক সিদ্ধান্ত আমাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবকে আমি জীবনে কখনো এমন ব্যথিত ও চিন্তিত দেখিনি, যেমনটি তখন দেখেছি। এমনকি তার সম্মানিত বাবা মাওলানা আব্দুল্লাহ শহীদ রহ. এর শাহাদাতের কঠিন মূহুর্তেও তিনি এমন বিচলিত ছিলেন না। যেমনটি মসজিদে আমীর হামজার শাহাদাতের পর হয়েছিল। আমিও আব্বাজানকে নিজের চোখের সামনে শহীদ হতে দেখেছি। আমার সামনে আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ রহ. কে গুলির আঘাতে ঝাঝরা করে দেয়া হয়েছে। আপনারা ধারণা করতে

পারেন যে, একজন নারী, একজন মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা আব্দুল্লাহ শহীদর রহ. এর মত স্নেহশীল ও মমতাবান বাবার শাহাদাত আমার অন্তর ও মস্তিষ্কে কেমন প্রভাব ফেলেছিল। তখন কিন্তু আমার মাঝে এই খুশি ও সান্তনা বিরাজমান ছিল যে, আব্বাজান শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা এবং সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছেন। তবে মসজিদে আমীর হামজা রা. এর শাহাদাতের খবর আমাকে অনেক ব্যথিত করেছে। মসজিদে আমীর হামজা রা. এর খসে পড়া ইটগুলো দেখে আমি এত কান্না করেছি যে, বাবার মৃত্যুতেও এতা কান্না করিনি।

ইসলামের নামে স্বাধীন হওয়া দেশে ইসলামী নিদর্শনাবলি ও ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী ঐতিহ্যের যে পরিমাণ জানাযা বের হচ্ছিল। মসজিদে আমীর হামজা রা. এর শাহাদাত ছিল তার শেষ।

আমাদের অন্তরে এর পূর্বে মসজিদে আমীর হামজা রা. এর ন্যায় আরো ৬টি ঘটনা অতিবাহিত হয়েছে। যার একেকটি ছিল আমাদের কাছে কেয়ামতের মত। আমরা এই অপেক্ষায় প্রহর গুনতাম যে, কোন একজন বিন কাসিম ওঠে আসবে যে কা'বার প্রতিচ্ছবি মসজিদগুলোর অভিভাবকত্বের জিম্মাদারী পালন করবে। আমরা এতে খুব আশ্চর্য হয়েছি এবং আফসোস করেছিলাম যে, ইন্ডিয়া বাবরী মসজিদের শাহাদাতের পর তৎক্ষনাত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সর্বাত্মক প্রতিবাদ হয়েছিল কিন্তু ইসলামাদে মসজিদে ইবনে আব্বাস রা. ছাড়াও অন্যান্য মসজিদের শাহাদাত এবং তার নিচে চাপা পড়া কুরআনুল কারীমের নুসখাগুলো মুসলমানদের ঈমানী চেতনা উজ্জীবিত করতে কেন ব্যর্থ হলো? যেদিন মসজিদে আমীর হামযা রা. শহীদ হয়েছে, সে দিনটা আমি বিস্ময়কর এক ব্যাথা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি। সারারাত আমার ঘুম হয়নি। মাওলানা সাহেবের অবস্থা এমন ছিল যে, তাকে দেখে আমার করুণা হতে লাগলো। তিনি সেদিন রাতের শেষ প্রহরে জায়নামাযে হেচকি দিয়ে দিয়ে কান্না করেছিলেন।

মেয়েদের প্রতিবাদ

পহেলা মুহাররাম ১৪২৮ হিজরী মুতাবেক ২০ জানুয়ারী ২০০৭ এর সকালে আমি যখনই মাদরাসায় গিয়ে পৌঁছলাম, কিছু ছাত্রীরা আমার নিকট দৌড়ে আসলো এবং বলল, আলেমা (এম এ) এবং আলিয়া (বি এ) ক্লাসের কিছু সিনিয়র ছাত্রী কয়েকজন শিক্ষিকার সাথে মিলে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ ও প্রতিবাদ করার জন্য মাদরাসার সাথে সংযুক্ত লাইব্রেরীকে প্রতিবাদের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে। এই অবস্থা আমার জন্য উদ্বেগের বিষয় ছিল। আমি দ্রুত ঐ ছাত্রীদের নিকট গেলাম। যখন আমি তাদেরকে মাদরাসায় ফিরে আসার জন্য বললাম, তখন তারা কান্না করে দিল এবং রেগে গিয়ে বলল, আপুজান, খবরদার! আমাদেরকে অপরাধী এবং অবাধ্য করবেন না। যদি আজও আমরা আল্লাহ তাআলার ঘরের শাহাদাতের বিরুদ্ধে কোন পতিক্রিয়া প্রকাশ না করি, তাহলে আমাদের কলিজা দুঃখে-কষ্টে ফেটে যাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কারণ যে ছাত্রীরা স্বাভাবিক সময়ে আমার সামনে কথা বলার সাহস পেতনা আজ তারা নিজেদের হৃদয়ের আক্রোশ প্রকাশ করছে। তাদের কথা দ্বীন ও শরীয়ার আলোকে এবং যুক্তির বিবেচনায় গ্রহনযোগ্য ছিল। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে তাকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা হলো। ছাত্রীদের অবস্থান তার সামনে তুলে ধরা হল। তিনি বললেন, আমি আজ রাতে ইস্তিখারা করেছি। কিন্তু আমার কিছুই বুঝে আসছিলনা। মসজিদ শাহাদাতের এই ধারাবাহিকতা কিভাবে বাধা দেয়া যাবে ? যদি এই মেয়েরা এই অ্যাকশন নিয়ে থাকে তাহলে হয়ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাতে কোন কল্যান নিহিত রয়েছে। তারপরেও আমি গাজী ভায়ের সাথে পরামর্শ করে আপনাদের জানাচ্ছি"।

মাওলানা সাহেব গাজী সাহেবের সাথে পরামর্শ করতে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে, হয়ত গাজী সাহেব বিষয়টি সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রশাসনকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জেলা প্রশাসনের অফিসারগণ এবং রাওলপিন্ডি ও ইসলামাদের সকল উলামায়ে

কেরাম উপস্থিত হয়েছেন। আর এমন মনে হলো যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। আমাদের মেয়েরা উলামায়ে কেরাম এবং জেলা প্রশাসনের নিকট সুস্পষ্টভাবে তাদের দাবীগুলো তুলে ধরে এবং অন্য সকল দাবীর মধ্য থেকে এই দাবীর উপর খুব জোর দিয়েছে যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত শহীদ হওয়া মসজিদগুলো নতুন করে নির্মাণ না করা হবে এবং যে সকল মসজিদকে শহীদ করে দেয়ার জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে তা বিলুপ্ত ঘোষণা না করবে ,ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের আন্দোলন বন্ধ করবে না।"

ছাত্রীদের এই দাবী একেবারে শরয়ী ও আইনী উভয় দৃষ্টিতে সঠিক ছিল। এজন্য আমরা তাদের সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মেয়েরা তো আর নিজেদের প্রয়োজনে কিংবা নিজেদের উপকারার্থে কিছু করছেনা। আবার তারা রাস্তায়ও নামছেনা, বরং একটি সংরক্ষিত চার দেয়ালের ভিতরে বসে একটি শরয়ী ও আইনী বৈধ দাবী উপস্থাপন করছে। এজন্য তাদের সমর্থন করা উচিৎ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরকার মেয়েদের এই বৈধ দাবী মেনে নেয়ার পরিবর্তে প্রোপাগাণ্ডার আগুন প্রজ্জলিত করে দিয়েছে। হুমকি-ধমকি দিয়ে প্রতিবাদ দমিয়ে দিতে চেয়েছে। গুলির ভয় দেখানো হয়েছে। কোনো কিছু যাচাই না করেই আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ৭টি মসজিদকে শহীদ করে তারা সরকারী রিট (পরওয়ানা) জারী করে দিয়েছে। ৭টি পবিত্রস্থান মসজিদকে শহীদ করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবাদের আওয়াজ এত উঁচু হয়নি যেমনটি লাইব্রেরী ইস্যুতে হয়েছে। একটি ছোট লাইব্রেরী যা কোনো পবিত্র স্থান নয় এবং তার কোন ক্ষতিও হয়নি। সেখানে ছাত্রীদের আন্দোলনের কারণে আসমান মাথায় তুলে নিয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ইযাযুল হক যার ব্যাপারে আমরা এতদিন ভাবতাম যে, সে মসজিদ মাদরাসার হিতাকাঙ্খি এবং দ্বীনি বিষয়ে সৎ। কিন্তু তিনি মুনাফিকের ন্যায় জগণ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমাদের মেয়েদের উপর যৌথ বাহিনীর আক্রমনের ভয় দেখিয়েছেন। এই সকল কিছু আমাদের দুঃখ, কষ্ট ও রাগ বাড়িয়ে দিয়েছে। অতপর ইজাজুল হক সর্বশেষ ধূর্ততা ও ধোকার চাল চেলেছে। আমরা যে সমস্ত উলামায়ে কেরামকে আমাদের আকাবির ও আমাদের মাথার

মুকুট মনে করতাম, সে দ্রুত করাচি গিয়ে তাদেরকে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

উপর মহল থেকে ইজাজুল হক সাহেবকে এই বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে যে, আকাবীরে উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে এই আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচীকে রুখে দিতে হবে। তাই ইজাযুল হক ক্রেডিট পাওয়ার আশায় ও নিজের মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখতে এই বিষয় নিয়ে দৌড়-ঝাপ করতে লাগলো।

আমাদের সাথে রসিকতা করা হয়েছে

মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব এবং আল্লামা গাজী শহীদ সাহেব উলামায়ে কেরামকে সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে আবেদন করেছেন, যেন তারা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন। কেননা সরকার তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে নিঃশেষ করতে এবং আমাদেরকে একা করতে দু'ধারী তরবারী ব্যবহার করছে এবং উলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের বয়ান রেকর্ড করা আছে। আমরা সেদিন থেকে বলছিলাম, সরকারের সাথে সমঝোতা শুধু একটা অভিনয় ছাড়া ভিন্ন কিছু না। মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব, শহীদ আল্লামা গাজী সাহেব এবং আন্দোলনের ছাত্র-ছাত্রীরা উলামায়ে কেরামের সাথে কখনো, না কোন বিষয়ে বেয়াদবী করেছে, না কোন অপরাধ করেছে, না কখনো তারা উলামায়ে কেরামের উপর আস্থা হারিয়েছে? বরং সে প্রতারণা আর ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে ৯ এবং ১০ জুলাই শেষরাতে সকল গোত্রের উপর আমাদের আকাবিরদের সামনেই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী ঘটনা সংগঠিত হয়।

প্রথম দিন থেকেই আমার শুধুমাত্র এই দুশ্চিন্তা ছিল যে, ইযাযুল হকের মতো ধোকাবাজ মন্ত্রিরা সমঝোতার আড়ালে মূলত মসজিদ ধ্বংস করার পথ মসৃণ করে এবং দেশে বদদ্বীনি এবং নোংরামী আর উলঙ্গপনার এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। লাইব্রেরীকে আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু বানানোর পর যখন মসজিদগুলো রক্ষা করার আন্দোলন শুরু হয়েছে। তখন চিন্তা করলাম, আজ যদি সেই সাত মসজিদকে পুনরায় নির্মানে সফলও হয়, তখন রাষ্ট্রের

১৪

রক্তাক্ত লাল মসজিদ

অন্য সকল মসজিদকে হেফাজত করার জিম্মাদারী আমরা কিভাবে নিব? কেননা আমাদের সাথে বিগত কয়েক বছর যাবত অত্যন্ত বাজেভাবে রসিকতা করা হচ্ছে। কখনো নারী অধিকারের নামে বেহায়াপনাকে প্রমোট করা হয়েছে। তখন আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। কখনো মুসলমান ভাইদেরকে গণহারে হত্যা করার জন্য নিজের অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়েছে। তখন আমরা তার বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছি। কখনো ম্যারাথনের নামে মেয়েদেরকে রাস্তায় উলঙ্গ দৌড়ানো হয়েছে। তখন আমরা তার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন করেছি। আর দ্বীনের দুশমনরা আমাদের মিছিল, মিটিং, সভা ও প্রতিবাদকে ভালোভাবে মেনে না নিয়ে অন্যায়ের সকল সীমা অতিক্রম করতে থাকলো।

এভাবে আমরা আর কত ফ্রন্ট থেকে পিছনে ফিরে আসতে থাকব? আমরা আর কত বিষয়ে আন্দোলন ও মিছিল চালিয়ে যাবো? অবশেষে আমরা কুরআন এবং সুন্নাহর আলোয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই সকল বিষয়ের মূল ভিত্তি তো হল ইসলামের নামে এবং কালীমার ধ্বনিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা-প্রচেষ্ঠা করা হবে। ঐ প্রচেষ্টাই করা হবে যা বিগত ৬০ বছর যাবত উলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার মানুষ করে আসছে। যা করতে করতে আমাদের বাবা নিজের জান উৎসর্গ করেছেন এবং যে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আওয়াজ তুলতে তুলতে মাওলানা আব্দুল আযীযের দাড়ি পেকে গিয়েছে।

লাল মসজিদ থেকে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠেছে কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হলো যখনই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠেছে তখনই আপন কিংবা পর সকলেই আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম– যে সরকার আমাদের কোন মিছিল মিটিংকে পরোয়া করছেনা। আর আজ আমাদের সামান্য প্রচেষ্টায় সংসদে হৈচৈ পড়ে গেল। সকল মিডিয়া অনৈতিকতার প্রচারকে তাদের কর্তব্য মনে করে তারা শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবীগুলোকে হেড লাইন বানিয়ে প্রচার করতে লাগলো।

লাল মসজিদ সকল ধর্মীয় আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল

ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবী এবং মেহনতের দরুন দেশব্যাপী জনসাধারণের মাঝে আশার আলো জলে উঠেছে। যুবকদের কাফেলা মাথায় পাগড়ী বেধে লাল মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। মাদরাসা, স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা এবং সাধারণ মহিলারা জামিয়া হাফসার ছাত্রীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাড়িয়ে গিয়েছে।

এরপর কি হলো? আমাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির ধমকি দেয়া হচ্ছিল। আমাদের মসজিদ মাদরাসা বারবার ঘেরাও করা হচ্ছিল। কিন্তু আল্‌হামদুলিল্লাহ! প্রত্যেকবার প্রশাসনের মুখে চপেটাঘাত করা হয়েছে। কেননা উলামায়ে কেরাম, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ মসজিদের সুরক্ষায় নিজেদের জান বিলিয়ে দিতে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক যুগেই পাকিস্তানের লাল মসজিদ সকল ধর্মীয় আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। "হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত" এই ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার পর জুলুম-অত্যাচারে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের আশা ও ভরসার স্থান হয়ে গিয়েছে। মানুষ নিজেদের মাসআলা-মাসায়েলের সমাধানের জন্য লাল মসজিদে আসা শুরু করে দিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব ও আল্লামা আব্দুর রশীদ গাজী শহীদ রহ. বহু বিপদগ্রস্থ মানুষের উপকার করেছেন। অনেক নির্যাতিতা বোনকে নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেছেন। ন্যায় বিচারের আশায় আদালতের দরজায় উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরা ব্যক্তিদের বিচার পেতে সাহায্য করেছেন। যখন মানুষ জানতে পেরেছে যে, লাল মসজিদ থেকে আশার আলো জ্বলে উঠেছে তখন তাদের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ দল বেধে লাল মসজিদে আসা শুরু করেছে। অগনিত যুবক এসে লাল মসজিদে অবস্থান নিয়েছে এবং নিজেদের প্রিয় ভূমিতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবনকে ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করেছে।

উপনিবেশকারী (সাম্রাজ্যবাদীদের) এজেন্ড এবং ভ্রান্ত সম্প্রদায় খুব সুক্ষ্ম ভাবে এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে। তাদের চোখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, পাকিস্তানের আদালতের নিয়মের উপর অনাস্থাশীল মানুষ লাল মসজিদকে নিজেদের আস্থার জায়গা হিসাবে মেনে নিয়েছে। তাহলে তো আমাদের জন্য আর কোন আশ্রয়স্থল বাকী নেই।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের বর্তমান সিস্টেম বিগত ৬০ বছর থেকে সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। অসহায় দরিদ্র মানুষের পিঠে অন্যায় ও অবিচারের ষ্টিম রোলার চালাচ্ছে। লাল মসজিদ থেকে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের যে নিয়ম বাস্তবায়নের আওয়াজ উঠেছে তাতে এই সিস্টেম ধ্বসে পড়েছে। মানুষের মাঝে এই কথার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, একমাত্র ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের নীতির মধ্যে রয়েছে সফলতা ও কামিয়াবী। তখন এই সিস্টেম ও তার রক্ষকদের এবং সুবিধাভোগীদের জন্য পাকিস্তানের এই জমীন সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

এই জন্য তারা নিজেদের সকল মাধ্যমকে ব্যবহার করে ইসলামী শাসন বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করার চেষ্টা শুরু করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কখনো মাদরাসার জমি নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে। কখনো সরকারী রিট জারী করে দিয়েছে। কখনো হত্যাকান্ড চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের এসব বিষয়ের কোন পরোয়া ছিলনা। কিন্তু আমাদের সাথে সবচেয়ে বড় যে অন্যায় হয়েছে তা হল, আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিদের অন্তরে আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে এজেন্সির পক্ষে কাজ করার অপবাদ দেয়া হয়েছে।

গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হয়েছে

আমাদের বিরুদ্ধে এমন ঘোলাটে পরিবেশ তৈরী করেছে যে, আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিরা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। সকলেই জানতেন যে, দ্বীনের হেফাজত ও তা প্রতিষ্ঠায় আমাদের বংশের অবদান কি ছিল। সকলের জানা ছিল যে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কিছুই চাচ্ছিনা। মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব তো পুরা জীবন দরবেশী আর ফকীরের বেশে কাটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের নিকট এমন অনেক সুযোগ এসেছিল। যদি আমরা বেচা-কেনা করতাম অর্থাৎ "কিছু দাও কিছু নাও" এই নীতি অবলম্বন করতাম তাহলে নিজেদের জন্য অনেক কিছু করতে পারতাম। এত পরিমান করতে পারতাম যে, অন্যরা তা কল্পনাও করতে পারবেনা। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমরা কখনো নিজেদের জন্য কিছুই চাইনি। আমরা আল্লাহর জন্য আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য

আমাদের সকল উপকার এমনকি জীবন বাজী রেখেছি এবং সর্বদা আযীমতের রাস্তা অবলম্বন করেছি।

কিন্তু বুঝে আসেনা আমাদেরকে কেন একা ও অভিভাবকহীন ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের অপরাধই বা কি ছিল? সকলে আমাদের দাবীর সমর্থন করেছিলেন। আমাদের মেহনতকে যুগোপযোগী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তখন আশা ভেঙ্গে যায়, যখন বলা হয় "লাল মসজিদওয়ালাদের পদ্ধতি ঠিক না"। আমরা সর্বদা হাত জোড় করে আবেদন করি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বেহায়াপনা বন্ধ করা বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একথা তো সকলেই মেনেই নিয়েছিল। যদি আমাদের মেহনতের পদ্ধতি ভুল হয় তাহলে সঠিক পদ্ধতিতে এই কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক অথবা আমাদের সামনে সঠিক পদ্ধতি উত্থাপন করা হোক। কিন্তু এমনটি কেউ করেনি। বরং একটা বড় গ্রুপ ছিল যারা খুব বিরোধিতা করেছে। আইনজীবী ভাইয়েরা একটি দুনিয়াবী বিষয়ে ঐক্য ও সম্প্রীতির কথা বলে সরকারকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের দ্বীনদার ভাইদের বিশুদ্ধ শরয়ী ও দ্বীনি ইস্যুতে তারা ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করতে পারেনি।

আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমলী পরিবর্তন শুরু করার লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারের প্রতি জোর প্রচেষ্টা চালু করেছি। মাওলানা আব্দুল আযীয বলেন, যতদিন সমাজে ছড়িয়ে পড়া বেহায়াপনা ও নোংরামী দূর করা হবেনা ততদিন সুশীল সমাজ গঠন ও ইসলামী ইনকিলাব (পরিবর্তন) সংগঠিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এজন্য মাওলানা সাহেব এই ফিকির শুরু করলেন যে, গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের যে যে স্থানে পতিতালয় গুলোতে যেসমস্ত মেয়েদের উপর নির্যাতন হচ্ছে, তারা আমাদের নিজেদের মেয়েদের মতই এবং যে সমস্ত যুবকদের বিপদগামী করা হচ্ছে তারা আমাদের ছেলেদের মতই। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম নোংরামীর বিষ ছড়িয়ে দেয়ার স্থানগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত শুরু করেছি। আমরা নোংরামীর ঐ আড্ডাখানাগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

আল্লাহ তাআলা সাক্ষী আছেন, আমরা জোরপূর্বক কারো দোকান বন্ধ করেনি। না কারো সিডি জব্দ করেছি। হ্যাঁ এমন কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিল যারা মাওলানা

আব্দুল আযীয সাহেবের বয়ানে প্রভাবিত হয়ে এবং ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রতিনিধিদের দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে নিজেই এই সকল নাজায়েয এবং নাপাক কারবার থেকে তাওবা করার ঘোষণা দিয়েছে এবং নিজ হাতে সেসকল খারাপ উপকরণগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে। সকলেই জানে যে, লাল মসজিদের বাহিরে একজন ব্যক্তি স্বেচ্চায় খুশী মনে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার উপকরণ জালিয়ে দিয়েছে।

এমনিভাবে বিহারের এক ব্যক্তি নিজের ভিডিও শপে থাকা খারাপ ও অশ্লীল উপকরণগুলো নিজ হাতে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রমের সময় আমাদের ছাত্রদেরকেও গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে। মূলত নতুন প্রজন্মকে রক্ষার জন্য অশ্লীল উপকরণ ধ্বংস গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের শক্তিকে দ্বীন ও ধর্মের খেদমতে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা ছিল। এই চেষ্টায় আমাদের এওয়ার্ড (পুরষ্কার) দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু উল্টো আমাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়েছে এবং আমাদেরকে ও আমাদের ছাত্রদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমাদের ছেলেদেরকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দি করা হয়েছে।

উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার দূষণ শেষ করতে না করতেই ইসলামাবাদে সেক্টর জি এর বাসিন্দারা এসে সেক্টর জি তে একটি অশ্লীল আড্ডাখানার বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা ও সমস্যার কথা জানিয়ে বলল, এই আড্ডাখানা কুখ্যাত নায়িকা শামীমা পরিচালনা করছে। এর কারণে আমাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে ঐ নায়িকাকে কিছু বলা দুঃসাধ্য। আপনারা এই বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নিন।

আমাদের শিক্ষিকারা একবার তাকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে তার বাসায় গিয়েছে। তারা তাকে বুঝিয়েছে, আল্লাহ তাআলার ভয় ও আখেরাতের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তাকে জানিয়েছে কিন্তু সে বিরত থাকেনি। দ্বিতীয়বার ছাত্রীরা গিয়েছে এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক কঠোর ভাষায় তাকে এসব খারাপ ধান্ধা (ব্যবসা) ছেড়ে দিতে বলেছে। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ার আশংকার কথা ভেবে ছাত্রীরা তাকে মাদরাসায় নিয়ে এসেছে। এই উদ্দেশ্যে যে, মাদরাসার পরিবেশে হয়ত

সে ভালো হয়ে যাবে এবং সেক্টর জি এর বাসিন্দারা তার এই অশ্লীলতা থেকে মুক্তি পাবে।

ঐ নায়িকা আমাদের সাথে কিছুদিন ছিল। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ভালো আপ্যায়ন করেছি। তার আরামের প্রতি খেয়াল রেখেছি। কেননা আমাদের খেয়াল ছিল তাকে ভালো করা। সে একদিন বলল, আমি আমার গুনাহের কাজ থেকে তাওবা করতে চাই। আমরা বললাম, তাহলে তো ভালো। পরবর্তীতে সে মিডিয়ায় নিজের তাওবা করার ঘোষণা দিয়েছে। তখন আমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আন্টি শামীমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ আমাদের আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আর তা সফলও হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ! যদি এই পদক্ষেপ না নেয়া হতো তাহলে হয়ত প্রশাসনের নিকট আমাদের দাবীগুলো তোতা পাখির আওয়াজের মত হতো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এই ঘটনার পর প্রশাসন নিজেই অশ্লীলতার অনেকগুলো স্থান আব্দুর রশিদ গাজী শহীদ রহ. এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে বন্ধ করে দিয়েছে এবং আন্টি শামীমের এর ন্যায় অনেকেই নিজে নিজেই গা ঢাকা দিয়েছে।

এরপর আমরা আমাদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছি। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা ও অশ্লীলতা বন্ধে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের অবস্থান পেশ করছিলাম কিন্তু আমাদেরকে বিভিন্নভাবে কোনঠাসা করা হচ্ছে। একেতো লাল মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত শত শত উলামায়ে কেরাম এবং ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু কারো গ্রেফতারের বিষয়ে কেউ তেমন তীব্র কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি। অন্যদিকে আমাদের মেয়েদের অপহরণ এই পরিমান ছিল যে, এই সময় ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ চায় যে, এই বিষয়ে কঠিন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি।

তাই শিক্ষিকাদের মুক্তির জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের জিম্মি করা হলো। পুলিশ কর্মকর্তারা নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে যে, তাদের সাথে কেমন উত্তম আচরণ করা হয়েছে। আর যখন আমাদের মেয়েদের মুক্তি হয়েছে তখন পুলিশ কর্মকর্তাদেরকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর "তাহরীকে ত্বলাবা ও ত্বলাবাত" অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চালু ছিল। আমাদের চেষ্টা ছিল যে, ইসালামের নামে অর্জিত দেশে আল্লাহ প্রদত্ব পবিত্র কাজ চালু

থাকবে। আমরা বারবার প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেছি পতিতালয়গুলো বন্ধ করে দেয়া হোক। কিন্তু প্রশাসন সর্বদা অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে বিদেশীদের বিষয়ে তো প্রশাসনের একেবারে জ্বালা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এই বিষয়ে খুব কষ্ট লাগতো যে, দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য ভিনদেশী রাসূলের মেহমানদের জন্য আমাদের সকল দরজা বন্ধ এবং আমরা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি। অথচ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে দেয়া বিদেশীদের ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নিতে ভয় করছি। আমাদের নিকট এলিট ক্লাসের সাথে সম্পৃক্ত মেয়েদের থেকে তথ্য আসছে এবং নতুন প্রজন্মের ধ্বংসের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ব্যক্তিবর্গ অবহিত করেছেন যে, কিভাবে ইসলামাবাদে আবাসিক হোটেলে এবং ফার্ম হাউজগুলোতে অশ্লিলতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। রেষ্ট ও গেষ্ট হাউজগুলোতে কি কি তামাশা হয়। এর মধ্যে মেসেজ সেন্টার গুলোর অবস্থা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।

যদি এই মেসেজ সেন্টার গুলোতে শুধু মাত্র বিদেশীদের আনাগোনা হতো তাহলে তা উপক্ষো করা যেত কিন্তু সেখানের অবস্থাতো পুরাই বিপরীত। আমাদের মন্ত্রী-মিনিষ্টার ও সংসদ সদস্যরা তার স্থায়ী গ্রাহক ছিল। যখন আমাদের পদক্ষেপে এসব লোকদের নষ্টামীতে বাধা পড়েছে। তখন তারা লাল মসজিদের বিপক্ষে পরিবেশ ঘোলাটে করা শুরু করে দিয়েছে।

অবশেষে আমাদের মসজিদ, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে তাদের খারাপ প্রতিশোধ এবং জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ বানিয়েছে। স্পা সেন্টার কিংবা বিভিন্ন রেষ্ট ও গেষ্ট হাউজগুলোতে চাকরীরত চাইনিজদের জোর করে মাদরাসায় নিয়ে আসার ইচ্ছা আমাদের ছিলনা। কিন্তু আমাদের চেষ্টা ছিল প্রশাসন যেভাবে মসজিদ ও মাদরাসার উপর ক্র্যাকডাউন চালায় তারচেয়ে কয়েকগুন বেশি জরুরী অশ্লীলতার আড্ডাখানাগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়।

আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু প্রশাসন বিদেশীদের নাম শুনেই জ্বর উঠে যায়। এজন্য আমরা সর্বশেষ বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা এসমস্ত চাইনিজদেরকে কষ্ট না দিয়ে পাক-চাইনিজ বন্ধুত্বের দোহায় দিয়ে সেচ্ছায় তাদেরকে চাইনা দূতাবাসের হাওলা করে দিয়েছি।

তারা আমাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করেছে এবং লাল মসজিদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে অন্তর থেকে প্রশংসা করেছে।

কিন্তু ঐ গ্রুপ যারা প্রথমেই আমাদের পিছনে আদা-জ্বল খেয়ে নেমেছে। তারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে এবং যুদ্ধ করতে অপারেশন পরিচালনা শুরু করে দিয়েছে। কিছুদিন পর রেঞ্জার্স এবং কমাণ্ডার্সরা লাল মসজিদ ঘেরাও করা শুরু করল। লাল মসজিদের আশপাশের বিল্ডিংগুলোর ছাদে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করতে লাগলো।

এব্যাপারে যখন উদ্বেগ প্রকাশ করা হলো, তখন আমাদেরকে মৌখিক সান্তনা দেয়া হলো যে, সরকারের অপারেশনের কোন ইচ্ছা নেই। অন্যদিকে খুব জোরদার ভাবে অপারেশনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের সকলের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সরকারের কিছু কর্মকর্তা মিথ্যা কথা বলা ও ধোকবাজী করার বিনিময়ে হয়ত বেতন নেয়। সরকার প্রতিটা মূহুর্তে আমাদেরকে ধোঁকা দিতে থাকে। কখনো কোন আলোচনার জন্য আসলে যখন আলোচনা ফলপ্রসু হতে যাবে তখনই আমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা অসহায় এবং শক্তিহীন। এরপর আবার অন্য কারো সাথে আলোচনা শুরু হয়।

যখন চৌধুরী সাজাআত হুসাইন সাহেব আলোচনা শুরু করেছেন। তখন আমরা মনে করেছি যে, চৌধুরী সাহেবের একটা প্রভাব রয়েছে। আর তিনি কিছুটা ভালো মানুষ। হয়ত মসজিদ পূনঃনির্মাণ ও দেশের অশ্লীলতাকে নির্মূল করার চেষ্টায় সফল হওয়া যাবে। কিন্তু তিনিও অসহায়ত্বের মুখামুখি হয়েছেন। তিনি মিডিয়ায় ঘোষণা দিয়েছেন যে, লাল মসজিদওয়ালাদের পক্ষ থেকে আমাকে পূর্ণ সমর্থন ও সমঝোতামূলক মনোভাব পাওয়া গেছে। অথচ সি ডি আই এবং আরো কিছু অদৃশ্য শক্তি আলোচনায় নাশকতা চালিয়েছে।

আলোচনা চলাকালীন একদিকে সমঝোতা ও বোঝাপড়ার কথা বলা হয় এবং শক্তি প্রয়োগ না করার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে অপারেশনের প্রস্তুতি করা হচ্ছিল। অবশেষে আমরা যেমনটি ধারণা করেছিলাম তাই হলো।

আমরা মোটেও সংঘাত চাইনি

আমরা মোটেও সংঘাত ও সহিংসতার পক্ষে ছিলাম না এবং আমাদের এমন কিছুর ইচ্ছাও ছিলনা। আমাদের ছয় মাসের শান্তিপূর্ণ চেষ্টা প্রচেষ্টা এই কথার সাক্ষ্য দেয়। কেননা আমাদের আন্দোলনের সময় কারো একটি আঙ্গুলও কাটা যায়নি। কেউ আহত হয়নি। বরং মজার ব্যাপার হলো, ৩ জুলাই যখন অপারেশনের জন্য আগত ফোর্স প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন মাওলানা সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখছেন যে, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন যুদ্ধ নেই। আপনাদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা শুধুমাত্র আইন-কানুনের পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করেছি। আপনারা অন্যদের কথায় মসজিদ, কুরআনে কারীম, নিস্পাপ মেয়েদের এবং নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি কখনো চালাবেন না। কিন্তু তারা কি বিরত থাকে?

তারা প্রথমে অসংখ্য টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করল। এরপর নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করল। যখন ফায়ার শুরু হয় তখন আমার কাছে একটি ছোট মেয়ে দাড়িয়েছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা আমাদের সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা আমাদের উপর গুলি চালাবে। আল্লাহ তাআলার কি মহিমা! হঠাৎ একটি বুলেট এসে তাকে মারাত্মকভাবে আঘাত করল। কিন্তু তারপরেও সে জীবন মরণের সন্ধিক্ষনেও এই কথা বলছে যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা আমাদের সৈন্যরা আমাদের উপর গুলি বর্ষণ করবে।

৩ জুলাই থেকে নিয়ে ১০ই জুলাই পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে। যেভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদের উপর জুলুম ও অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালানো হয়েছে। এমনটি হয়ত ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। আমরা কখনো কল্পনাও করিনি যে, আমাদের সৈন্য ভাইয়েরা যাদেরকে আজ পর্যন্ত নিজেদের রক্ষাকারী মনে করতাম। তাদের থেকে আমরা কশ্মিনকালেও এমনটি আশা করিনি যে, তারা এতদূর পর্যন্ত চলে আসবে। যখন আমাদের বাচ্চাগুলো শহীদ হতে লাগলো তখন মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব মসজিদের এরিয়ায় গেলেন। সেখানে চারদিকে নিরস্ত্র নিস্পাপ বাচ্ছাদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তিনি নির্যাতিত শহীদদের মাথায় হাত বুলালেন এবং অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

মাওলানা যেহেতু অনেক নরম দিলের মানুষ ছিলেন এবং কখনো খুন-খারাবীর মধ্যে ছিলেন না। এই জন্য যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন তিনি পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, যে কোন ভাবেই হোক এই অপারেশনকে প্রতিহত করা হবে। যেহেতু পূর্বে থেকে কিছু সরকারী কর্মকর্তা সমঝোতার আলোচনার কথা বলছিল। তাই মাওলানা সাহেব তাদের কথায় এবং ধোকায় পড়ে গেলেন এবং খুন-খারাবী বন্ধের জন্য আলোচনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। আমি মাওলানার বাহিরে যাওয়ার পক্ষে ছিলাম না। আমি যতবার ইস্তিখারা করেছি ততবারই মাওলানার বাহিরে বের হওয়ার বিষয়ে অন্তর সাঁয় দিচ্ছিলনা। এজন্য আমি তার গ্রেফতার কিংবা শাহাদাত উভয়টির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। মাওলানাকে কারা কিভাবে গ্রেফতার করেছে আমি সেটা বিস্তারিত বলছিনা। বরং (وأفوض أمري إلى الله) আমরা আমাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত করলাম।

মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের গ্রেফতার

সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, মাওলানাকে চরম অপমান ও অপদস্থ করে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর মাওলানার জীবনকে ব্যঙ্গ করে আমাদেরকে চরম যন্ত্রণা ও কষ্টে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়া হয়েছে। মাওলানার বিষয়ে প্রচার করা হয়েছে যে, মাওলানা নিজের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যাচ্ছে। যদি তিনি নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তা করতেন তাহলে তিনি নিজের বৃদ্ধ মাকে ভিতরে কেন ছেড়ে গেলেন। নিজের যুবক ছেলে হাসসানকে অবশ্যই সাথে নিয়ে যেতেন। অন্যগুলো বাদ দিলেও তো মাওলানা তার প্রিয় আসমাকে ছেড়ে নিজের জীবন বাঁচাতে কখনো প্রস্তুত হতেন না।

মাওলানার গ্রেফতারের পর আমরা আশা করছিলাম যে, হয়ত মাওলানার গ্রেফতারের কুরবানীর মাধ্যমে অপারেশন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জালেমদের রক্ত পিপাসা তারপরেও মিটেনি। তারা নির্বিচারে ফায়ার শুরু করল এবং আগুনের গোলার বৃষ্টি হতে লাগলো। কেননা তাদের উদ্দেশ্য শুধু মাওলানা ও গাজী সাহেবকে গ্রেফতার করাই নয় বরং তারা তাদের মনিবদের আনন্দ দিতে এবং আমেরিকাকে খুশি করতে, ডলার ও এফ ষোল বিমানের আশায় নিজেদের ছোট

ছোট ছেলে মেয়েদেরকে নির্মম ও নৃসংশভাবে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

ভুলতে পরিনি সেই ৭টি দিনের কথা

সেই ৭টি দিন আমার জীবনের অবিস্মরণীয়। যখন আমি আমার ছেলে-মেয়েদের পিপাসা ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখেছি। এই দৃশ্য যখন আমার অন্তরে ভেসে উঠে তখন আমার অন্তর কেঁপে ওঠে। আমার সামনে আমার ছোট ছোট মেয়েরা রক্তে রঞ্জিত হয়ে মাটিতে ছটপট করছে। তাদের জখম থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তারা কিছু খেতে চাইলে আমার কাছে সান্তনা দেয়া ছাড়া আর কিছুই দেয়ার মত ছিলনা।

যখন তারা পানি চাইতো তখন আমি অসহায়ের ন্যায় হাত মেলে বসে থাকতাম। সাতদিনের শত শত মিনিট এবং হাজারো সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিটা মিনিট প্রতিটা সেকেন্ড আমাদের জন্য একেকটা কেয়ামতের ন্যায় অতিবাহিত হয়েছে। আপনারা মানুষদেরকে গুলির আঘাতে মারা যেতে দেখেছেন। অসুস্থতার দরুন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে দেখেছেন কিন্তু ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে কাউকে দুর্দশা ও হতাশায় মৃত্যু বরণ করতে দেখেননি।

আপনারা যুবকদের শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে তো অবশ্যই দেখেছেন। কিন্তু ফুলকলির মত বাচ্ছাদের শরীর থেকে রক্তের বন্যা বইতে দেখেননি। সেটা কতটা ভয়াবহ ছিল! যেখানে আমাদের মাদরাসায় শত শত এতিম অসহায় ছাত্রীদের জন্য খাবার পাকানো হতো, আজ সেখানে রুটিও পাওয়া যাচ্ছেনা। জালিমরা শুরুতেই পাকঘরের উপর এলোপাতাড়ি বোমা নিক্ষেপ করে তা ধ্বংস করে দিয়েছে।

প্রথম কয়েকদিন তো খাবার ছিল, কিন্তু এরপর খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। মাদরাসার ক্যান্টিনে কিছু টপি (মিষ্টিজাতীয় খাবার) এবং কিছু বিস্কুট পেয়ে মেয়েদের মাঝে তা বন্টন করে দেয়া হলো। টপি খেয়ে জীবিত মানুষ বেচে থাকাই অসম্ভব। এরপর শেষ পর্যন্ত পাতা খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। যখন পাকিস্তানের সকল মানুষ ভালো, সুস্বাদু খাবার ও আল্লাহর অসংখ্য

নেয়ামত খাচ্ছে সে মূহুর্তে আমার মেয়েরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করছে। আমরা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে যে সমস্ত মেয়েদের খাবারের ব্যবস্থা করছিলাম, তাদের অসহায়ের ন্যায় গাছের পাতা খাওয়া দেখে খুব কষ্ট হতো। কিন্তু যখন "গাযওয়ায়ে যাতুর রিক্বা" এর কথা স্মরণ হতো, সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুধার যন্ত্রণায় গাছের পাতা খাওয়ার কথা মনে পড়ত, তখন নিজেরা সান্তনা পেয়ে যেতাম যে, আমাদের মেয়েরা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত জিন্দা করছে।

আমাদের চেষ্টা ছিল মেয়েদেরকে কোনভাবে বের করে দেয়া। আমরা মেয়েদেরকে বারবার উদ্বুদ্ধ করে বাহিরে বের করে দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাদের উত্তর ছিল যে, আজ আমরা আগুনে জ্বলসে যাওয়া কুরআনের পাতাসমূহ, গুলির আঘাতে জর্জরিত মসজিদ, মাদরাসা ও নিজেদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের একা ছেড়ে বাহিরে যেতে কোন ভাবেই রাজী না।

আমি সেই দৃশ্য কখনো ভুলতে পারবোনা। একটি মেয়ের বাবা তাকে নেয়ার জন্য এসেছে। তিনি তার মেয়েকে খুব জোরাজোরি করছেন যেন সে তার সাথে চলে যায়। কিন্তু ঐ মেয়ে বারবার বলছিল, আমি কখনো এখান থেকে যাবোনা। আমি এখানে শহীদ হয়ে যাবো। যখন তার বাবা খুব বেশি জোরাজোরি করছেন, তখন সে আশ্চর্যরকম আচরণ করলো। সে তার বৃদ্ধ বাবার পায়ের গোড়ায় বসে তার সামনে সাদা দাড়ি ওয়ালা একজন শহীদের লাশ রেখে দিয়েছে এবং ঐ মেয়ে এই শহীদের দিকে ইশারা করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, হে আমার বাবা! আপনি এই শহীদের ওয়াস্তে আমাকে আপনার সাথে না নিয়ে এখানে রেখে যান। এরপর তার বাবা বাধ্য হয়ে তার সামনে আত্মসমর্পন করে।

আমি অনেক কষ্ট করে মেয়েদের অনেককে উদ্বুদ্ধ করে জামিয়া হাফসা থেকে বাহিরে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। কেননা খাদ্য স্বল্পতার দরুণ মেয়েদেরকে ভিতরে রাখা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে এবং পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িছে। কিন্তু যখন বাচ্চারা বলত, আপু! যারা বড় হুজুরের মত সম্মানিত একজন মানুষকে এত কষ্ট দিয়েছে, অপমান

করার চেষ্টা করেছে। যারা আমাদের ভাইদেরকে ধোঁকা দিয়ে বাহিরে ডেকে নিয়ে জেলে বন্দি করেছে। তাদের জামা খুলে তাদের হাত পিছনে বেধে দিয়েছে। এই ক্ষুধার্ত জানোয়ারদের উপর দয়া দেখানোর জন্য কেন আপনি আমাদেরকে বাহিরে পাঠাতে চাচ্ছেন।

তখন আমি প্রতিউত্তর না দিতে পেরে চুপ হয়ে যেতাম। এই সাত দিনে তারা একবারও বলেনি, হায়! কেন আমাদেরকে ভিতরে রাখা হয়েছে। তারা সব সময় বলতো, আমরা এখানে শহীদ হয়ে যাবো কিন্তু বাহিরে বের হবো না। আমরা ইজ্জত ও শাহাদাতের জীবনকে অপমানের মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দিব না। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হলো, বাহিরে আমাদের ব্যাপারে প্রপাগাণ্ডা ছড়ানো হচ্ছে যে, আমরা ভিতরে মেয়েদেরকে জিম্মি করে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছি।

সবশেষে আমাদের নিকট দুই ধরণের মেয়েরা ছিল। এক প্রকার হলো ঐসব মেয়ে যারা তাদের মা-বাবা থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য শহীদ হওয়ার জন্য অনুমতি নিতে সক্ষম হয়েছে। আর বহুসংখ্যক হলো অসহায়, এতিম মেয়ে। যাদের কোন পরিবার ছিলনা। মূলত ২০০৫ সালের ভূমিকম্পের পর মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব রহ. আল-কাসিম ফাউন্ডেশনের সেচ্চাসেবকদেরকে বালাকোট এবং কাশ্মীর পাঠিয়ে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, যত অভিভাবকহীন, এতিম ও অসহায় মেয়ে আছে, তারা যদি আমাদের এখানে আসতে চায় তাহলে তাদের সকলকে যেন নিয়ে আসে। এরপর যখন ঐসমস্ত দরিদ্র ছেলে মেয়েগুলো আমাদের মাদরাসায় আসল। তখন মাওলানা আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা শুনালেন। একবার ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি এতিম ছেলেকে ঘরে নিয়ে এসেছেন এবং বললেন, আজ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বাবা আর আয়েশা রা. তোমার মা।

মাওলানা সেই ঘটনা বলে আমাকে বললেন, আজ আমাদের রাসূলের সুন্নত জিন্দা করার সুযোগ হয়েছে। এজন্য এখন এই বাচ্চাগুলোকে আমাদের

সন্তানের চেয়েও অধিক ভালোবাসা ও স্নেহ করার চেষ্টা করব। আমরা তাদের থাকা-খাওয়া, জামা-কাপড় এবং খেলনার ব্যবস্থা করেছি। এই অসংখ্য মেয়েরা জামেয়া হাফসাতেই থেকে গেল। সে ভূমিকম্পের পরে এতিম, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের দুঃখ একটু হালকা হয়েছে। এখন পুনরায় সে কঠিন পরিস্থিতিতে বেচে থাকার সাহস পাচ্ছেনা। তারা আমাকে এসে স্পষ্ট ভাষায় বলল, আপু! আমরা বাহিরে যেতে চাইনা। বাহিরে গেলে কোথায় যাবো। কাদের ছায়ায় আমরা থাকবো। আপনার মত মায়া, মমতা, স্নেহ ও ভালোবাসা কে দিবে? আমি এই মেয়েদের সামনে অসহায় হয়ে পড়লাম।

আমরা আল্লাহ তাআলার খুব নিকটবর্তী

এদিকে আমার শত শত মেয়েরা আমার কোলে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেছে। কালিমা পড়ে নিজেদের প্রাণ রবের হাতে সঁপে দিয়েছে। কিন্তু একটি মেয়ের শাহাদাত আমি কখনো ভুলতে পারবো না। ঘটনাটা এমন ছিল যে, একজন শিক্ষিকার হাতে কিছু আলু এসেছে। তিনি লাকড়ি জমা করে সেগুলো পাকানোর চেষ্টা করছেন। ঐ আলু যখন কোনরকম খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। তো আমাকে একটি ছোট মেয়ে এসে বলল, আপু! এই আলু বাহিরে ক্ষুধার্ত ভাইদের দিয়ে আসব? আমি বললাম, বেটা! কালিমা পড়তে পড়তে যাও। যদি বাহিরে কোন ভাইকে মাদরাসার দরজার পাশে পেয়ে যাও তাহলে তাকে এই আলু দিয়ে আসবে। ঐ মেয়েটি বাহিরে যাওয়ার ১৫/২০ মিনিট পর কোন তালিবুল ইলমের চিৎকার শুনা গেল, সে জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে বলতেছিল, উম্মে হাসসান কোথায়? আপুজান কোথায়? আমরা সকলেই বোরকা পরিহিত ছিলাম। আমি সামনে গিয়ে দেখি, রক্তে রঞ্জিত আমার সেই ছোট্ট মেয়েটি, যাকে আলু নিয়ে কোন ক্ষুধার্ত ভাইকে দিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলাম। তাকে এক তালিবুল ইলম রক্তাক্ত অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে এসেছে। আমি তাকে আমার কোলে নিয়েছি। সে কালিমা পড়তে পড়তে চির নিদ্রায় ডলে পড়েছে। এই মেয়েটিকে নিয়ে আসা তালিবুল ইলম জানিয়েছে যে, আমার সামনে তার গায়ে একটি বুলেট এসে আঘাত করল। সে মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর আমি তাকে লম্বা করে শুইয়ে দিয়ে বললাম, কালিমা পড়ো। সে উত্তর দিল, আমি তো কালিমা

আগে থেকেই পড়ছি। কেননা আমাকে আপু বলেছেন কালিমা পড়তে পড়তে যাবে। তবে ভাইয়া! আমি মারাত্মক আহত হয়েছি, আমার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিন্তু তারপরেও আমার সামন্য কষ্টও হচ্ছেনা কেন? এরপর যখন আমি এই মেয়েকে ভিতরে নিয়ে আসার জন্য উঠালাম, তখন সে বলতে লাগলো, ভাইয়া! আমাকে দ্রুত আপুর কাছে নিয়ে চলুন। আর আমি দৌড়ে আপনার কাছে নিয়ে আসলাম।

সানিয়া নামের আরো একটি মেয়ে তার চেয়েও বেশি ঈমানের অধিকারী। আমি যখন মেয়েদেরকে উৎসাহিত করতে এই কথা বললাম যে, আমরা এই মূহুর্তে পরীক্ষায় পতিত হয়েছি। আর আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন।

আমার এই কথা শুনে ইবতিদাইয়া স্তরের একটি ছোট ছাত্রী সানিয়া বারবার আমাকে বলছিল যে, আমার এই কথা বিশ্বাস হচ্ছেনা যে, আমরা আল্লাহ তাআলার খুব নিকটবর্তী। আল্লাহ আমাদের খুব ভালোবাসেন। যদি আল্লাহ আমাদের এতই ভালোবাসেন তাহলে জুলুম ও নির্যাতনের এত বড় পাহাড় কেন আমাদের উপর ভেঙ্গে পড়লো। আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার বিশ্বাসই হচ্ছেনা। ইতিমধ্যে মাগরিবের সময় জামিয়া হাফসার বারান্দায় বৃষ্টির পানি রাখা বালতি গুলো থেকে সে পানি আনতে গেল। আমি বললাম, হে আমার মেয়ে সানিয়া! তায়াম্মুম করে নামায পড়। পানি পূর্ব থেকেই কম। কিন্তু সে তো সেই মহা জগতের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বালতি থেকে পানি নিয়ে অযু করল। অযু শেষ করে যখনই সে দাঁড়িয়ে ছোট্ট আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ছিল তখনই একটি গুলি এসে তার কণ্ঠনালীকে ছিদ্র করে বের হয়ে গেল। সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে গেল। আমি দৌড়ে এসে তাকে উঠাতে গেলাম, তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে জোরে হাসা শুরু করল। আর বলল, আপুজান! আপনি সঠিক বলেছেন। বাস্তবেই আল্লাহ আমাদের অনেক ভালোবাসেন। এরপর সে চিরদিনের জন্য চুপ হয়ে গেল।

একদিন আমরা কিছু চাউল পেয়ে দরজা-জানালার ভেঙে যাওয়া কাঠের টুকরা একত্রিত করে বৃষ্টির পানি দিয়ে তা রান্না করে বাচ্চাদেরকে দিয়ে বললাম, ভাতের মাড়গুলো তোমরা খাও আর ভাতগুলো আহত ছাত্রদেরকে খাইয়ে দাও। এক ছাত্র ভাত নিয়ে মসজিদে আহতদেরকে দিতে গেল। যখনই সে বাহিরে বের হলো একটা গুলি এসে তার গায়ে লাগলো। সাথে সাথে সে কালিমা পড়ল। আমি তার কাছে যেতে চেয়েছি কিন্তু হাসসান আমাকে যেতে দেয়নি। সে নিজে তাকে কালিমা পড়িয়ে জান্নাতের পথে অগ্রসর করে দিয়েছে।

অপারেশন চলাকালে প্রতিদিন আমি আমার জানের পরোয়া না করে বিভিন্ন কামরায় যেতাম। ক্লাসরুম গুলোতে যেতাম। মেয়েদেরকে সান্তনা দিতাম। তারা সর্বদা যিকির এবং মুনাজাতে মশগুল থাকতো। তাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর দরবারে অকাতরে রোনাজারী করছে। কেউ নিজেদের আহত সাথীদের সেবা শুশ্রূষা করছে।

যখন জালিমরা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা শুরু করল। এবং তাখাসসুসের ক্লাসে এবং লাইব্রেরীতে আগুন লেগে গেল এবং হেফজ বিভাগে রাখা কুরআন কারীমের নুসখাগুলো জ্বলছে যাচ্ছিল। তখন আমার কিছু সাহসী ছাত্রীরা নরপিশাচ পারভেজের আগুনের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ রক্ষা করার জন্য দৌড় দিল। অতপর পবিত্র কিতাবের সাথে তারাও আগুনে জ্বলে শহীদ হয়ে গেল। আমি এই সাতদিনে আল্লাহকে খুব নিকটে দেখেছি। সত্তর মায়ের থেকেও অধিক দয়ালু পেয়েছি।

আল্লাহ তাআলার নুসরাত

সেদিন সম্ভবত শুক্রবার রাত ছিল। যখন আমি মাওলানা ইনআমুল্লাহ সাহেবের নামে পত্র পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা আপনার দুআ কবুল করেন। আপনি আসমান থেকে মান্না সাল্ওয়া পাঠানোর জন্য আল্লাহ

তাআলার নিকট দুআ করুন। যেন তিনি এই বাচ্ছাদের জন্য খাবার পানির ব্যবস্থা করেন এবং বিশাক্ত টিয়ার গ্যাস থেকে হেফাজত করেন।

জানিনা মাওলানা ইনআমুল্লাহ শহীদ রহ. সেদিন কি দুআ করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুশলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। ফলে আমরা সকল পাত্র পানিতে পূর্ণ করে নিয়েছি। প্রবল তূফান হয়েছে যে, বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই রাতেই মসজিদের মেহরাবে মধুর দুটি ড্রাম পাওয়া গিয়েছে। আমি মধুর সেই স্বাধ জীবনে কখনো আস্বাদন করিনি। একদিকে শহীদদের শরীর থেকে অনন্য একটা ঘ্রাণ বের হচ্ছে। তারপরেও সে মধুর ঘ্রাণ এত প্রখর ছিল যে, আমরা যে পাত্রগুলোতে মধু খেয়েছি সেগুলো থেকেও ঘ্রাণ আসছিল। এই রহস্য আজো আমার উদ্ঘাটন হয়নি যে, এই মধু কোথেকে এসেছে। হয়ত এমন রিযিকের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (ويرزقه من حيث لايحتسب) "আল্লাহ তার নেক বান্দাদেরকে এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন যা তারা ধারণা কিংবা কল্পনাও করেনা।"

আমার বারবার স্মরণ আসছিল, যে প্রভু হযরত মারয়াম আ. কে বেমৌসুমী ফল দিতে পারেন তিনি জামিয়া হাফসার নির্যাতিতা নির্দোষ মারয়ামদেরকে তাঁর ধনভাণ্ডার থেকে মধু কেন দিতে পারেন না।

মধু ছাড়াও আমরা আল্লাহ তাআলার সাহায্যের আশ্চর্য আশ্চর্য অনেক দৃশ্য দেখেছি। শহীদ ছেলে মেয়েদের শরীর থেকে ছড়িয়ে যাওয়া সুগন্ধি আমাদের উৎসাহ দিতো। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব এবং শাহাদাতের সত্যতা সুস্পষ্ট হচ্ছিল।

গুলির থেকেও টিয়ার গ্যাসের কারণে খুব কষ্ট হচ্ছিল। গ্যাসের কারণে দম বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। এমন মনে হতো যেন কোন মানুষ গলা টিপে ধরে রেখেছে। মেয়েরা বলত, আপুজান! দুআ করুন, আমরা গুলির আঘাতে শহীদ হয়ে যাই। কিন্তু এই গ্যাসের কষ্ট আমরা আর সহ্য করতে পারছিনা।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার শান দেখুন, যে রাতে অধিক পরিমাণে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হতো সে রাতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বৃষ্টি দিয়ে দিতেন।

ঝড় বাতাস শুরু হতো এবং আল্লাহ তাআলা তাদের গ্যাস তাদের উপর নিয়ে ফেলতো।

আমাদের নিকট শুধুমাত্র ১৪টি ক্লাসিনকপ ছিল। আর গুলিও না থাকার মত ছিল। গাজী সাহেবের পক্ষ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ ছিল যে, কেউ যেন অতিরিক্ত ফায়ার না করে। মাঝে মধ্যে কিছুক্ষণ পরপর একটা দুইটা ফায়ার করো যাতে তারা এটা বুঝতে না পারে যে, আমরা নিরস্ত্র, অথবা আমাদের নিকট অস্ত্র কম আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ছিল ভিন্ন। যখন চারদিক থেকে মসজিদ ও মাদরাসার উপর ভারী অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করা হতো তখন সৈন্যদের নিজেদের গুলি ক্রস হয়ে অপর প্রান্তের সৈন্যের গায়ে আঘাত করতো। আর তারা মনে করতো হয়ত ভিতর থেকে ফায়ার হচ্ছে।

এই ঘটনায় আমার অন্তরে কতটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে কেউ বলতে পারবেনা। ছেলে মেয়েদের বিষয় বাদ দিয়ে আমি আপনাকে কিভাবে বুঝাবো যে, যখন মসজিদের পবিত্র দেয়ালগুলো এবং আলমারীর মধ্যে থাকা কুরআনে কারীমগুলো গুলির আঘাতে ঝাঝরা হয়ে যাচ্ছিল। তখন আমাদের কলিজা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

যখন আমাদের সামনে জামিয়া হাফসার বড় বড় কিতাবের পৃষ্ঠাগুলো এবং কুরআনুল কারীমের পাতাগুলো জ্বলতেছে তখন আমরা জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে আমাদের চাদর ও বোরকা দিয়ে আগুন নিভানোর জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম। সেখানে প্রতিটি কামরায় প্রতিটি ক্লাসরুমে কুরআন মাজীদ ছিল। বড় বড় কিতাবাদী ছিল। হাদীসের পাতা ছিল। স্বতী-স্বাধ্বী মেয়েরা ছিল। কিন্তু আমাদের কি করার ছিল?

ছেলে মেয়েদেরকে সান্তনা দিব? কুরআনের আয়াত পড়ে পড়ে তার ফজীলত বর্ণনা করব? তাদেরকে উৎসাহিত করব? তাদের প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করব? তাদের ঝরতে থাকা অশ্রু মুছে দিব? নাকি জ্বলতে থাকা কুরআনুল কারীমের আগুন নিভাবো? আমাদের ছেলে মেয়েদের চেয়ে কুরআনুল কারীমের জন্য বেশি চিন্তা হচ্ছিল, কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ণ চেষ্টার পরেও কুরআনুল কারীমের মর্যাদা রক্ষা করতে পারিনি।

আম্মীজানের ঈমানী জযবা

কষ্টের মাঝে একটুখানি সুখের ছোঁয়া

এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের বিষয় ছিল, অনেক উলামায়ে কেরাম আমাদের সাথে মোবাইলে কথা বলার জন্যও রাজী ছিলনা। আমি কখনো গাজী শহীদ রহ. এর ঐ অবস্থার কথা ভুলতে পারবোনা। যখন উলামায়ে কেরামের মোবাইল নাম্বারগুলো এক এক করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাদের মোবাইল বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অথবা তারা আমাদের অসহায়ত্ব ও নির্যাতনের কথা শুনতে রাজী না। গাজী সাহেব প্রায় আধা ঘন্টা যাবত বিভিন্ন নাম্বারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু যখন কোন নাম্বার বন্ধ পেতেন অথবা তারা গাজী সাহেবের নাম শুনে মোবাইল বন্ধ করে দিত তখন গাজী সাহেব তাদের এমন আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন।

গাজী সাহেবের হিম্মত, সাহস ও বাহাদূরি এবং তার বিচক্ষণতা আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছে। কিন্তু তার জযবা এবং ইখলাস আরো অধিক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ছিল। আমি কখনো কখনো তাকে বলতাম যে, ছেলে মেয়েদেরকে কিছু ওসীয়ত করে দেন। তখন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিস্ময়করভাবে বলতেন, "আমি যে রবের জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছি তিনি আমার পরিবার সন্তান সন্ততিকে হেফাজত করবেন এবং লালন পালন করবেন"।

আম্মীজানের ঈমানী জযবাও অধিক বিস্ময়কর ছিল। তিনি বলতেন, "দেখেছ, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করবেন, এখন আমার এই বিছানায় শাহাদাত লাভ হবে"। তিনি বলতেন, এই নোংরা পৃথিবীতে কি-বা আছে? জান্নাতে চলে যাবো। যেখানে কোন জালেম ও স্বৈরাচার বলতে কেউ থাকবেনা।"

যে কেউ আম্মীজানের সাথে সাক্ষাত করত, তার আলোচনা শুনতো সে তার ঈমানের মধ্যে উন্নতি উপলব্দি করতো। আর আমার হাসসান অত্যন্ত আশ্চর্য

কথা বলত যে, আমাদের এই (সওমে ইছাল) ধারাবাহিক রোযার ইফতার দাদা ও আব্বুর সাথে করব" ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তাকে সৌভাগ্যবান করেছেন যে, এত ছোট বয়সেই তার শহীদ দাদা ও আব্বুর কাছে পৌছে গিয়েছে।

ওই দিকে মাওলানার গ্রেফতারের পর প্রতিদিন গাজী সাহেব আমাকে বলতেন যে, ভাবী! আপনি বাহিরে চলে যান। কিন্তু ৮ই জুলাই গাজী সাহেব আমাকে কঠিনভাবে অনুরোধ করে বাহিরে বের হতে বাধ্য করে।

হাস্‌সান এবং গাজী সাহেব আমাকে বারবার বলতো যে, আপনাকে আমীর হিসাবে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আপনি বাহিরে চলে যান। কেননা যদি আপনি জীবিত অবস্থায় এই জালিমদের হাতে গ্রেফতার হন তাহলে তারা আপনাকে চিরদিনের জন্য গুম করে ফেলবে।

কারণ যারা আম্মিজানের লাশ গুম করে ফেলেছে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না তারা আপনার সাথে কি করবে। যখন আমি আমার অন্যান্য আহত মেয়েদের নিয়ে সেখান থেকে বের হচ্ছি তখন আমার কলিজার টুকরা মেয়েদের লাশ এবং কিতাবাদী সবকিছু সেখানে রেখে এসেছি। একজন মা-ই একমাত্র এই অবস্থা অনুভব করতে পারে।

যখন আমার একমাত্র অল্পবয়সি ছেলে শহীদ হাসসানের কপালে শেষবার চুম্বন করেছি তখন আমার অন্তরে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার পরেও আমি হাসসানকে বলেছি, হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান! তোমাকে আমি আজকের জন্যই লালন পালন করেছি। হিম্মতহারা হবেনা, দৃঢ়তার পরিচয় দিবে। মসজিদের পবিত্রতা, কুরআনুল কারীমের সম্মান ও মাযলুম ভাই বোনদের রক্ষায় যদি আমার আল্লাহ তোমার কুরবানী কবুল করে নেন তাহলে তা আমার জন্য সৌভাগ্য ও সম্মানের উৎস হবে।

আমি হাসসানকে বলেছি, হে আমার প্রিয় ছেলে! বুকে গুলি খাবে। দেখো, আমাদেরকে আল্লাহর সামনে লজ্জিত করোনা। এই কথার খেয়াল রাখবে যে,

আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে লজ্জিত না হই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীদের মত ধৈর্য এবং সাহস কাউকে দেননি। আর আমি তো সাধারণ এক মহিলা মানুষ। সবরের ফাজায়েল এবং প্রতিদানের আশাই তো জীবিত থাকার সাহস জোগায়। কিন্তু মানবিক স্বভাব এবং প্রাকৃতিক চাহিদা যার দরুন স্বয়ং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অল্প বয়সী ছেলে ইবরাহিমকে কোলে নিয়ে কেঁদে দিয়েছেন। আর আমরা কে?

সাইয়িদা ফাতিমা রা. এর সাথে সম্পৃক্ত একটি কবিতা বারবার স্মরণ হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন–

صبت علي مصائب لو أنها
صبت على الأيام صرن لياليا

দুঃখ বেদনা ছুঁয়েছে আমায় যত
তার ভারে দিন রাত হয়ে যেত।

[আমার উপর যে বিপদ ও মসীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, যদি এই কষ্ট দিনের উপর পড়তো তাহলে সে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেত এবং চিন্তা ও পেরেশানীতে দিন রাতে পরিবর্তন হয়ে যেত]।

হৃদয় বিদারক দৃশ্য

সে সময়ও আমার অবস্থা খুব নাজুক ছিল। ৩ জুলাই থেকে নিয়ে ১০ই জুলাই পর্যন্ত লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসায় যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখেছি তা আমাকে না শান্তিতে জীবন যাপন করতে দিচ্ছে আর না আমাকে আরামে ঘুমাতে দিচ্ছে। আমি যখনই খাবার সামনে নিয়ে বসি তখন ক্ষুধা আর পিপাসায় কাতর হয়ে ছটপট করা মেয়েদের কথা আমার স্মরণ হয়।

রমযান মাসে যখন ইফতারীর জন্য দস্তরখান বিছানো হয়। আর আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন নিয়ামত সাজানো হয় তখন পেয়ারা পাতার কথা আমার স্মরণ হয়। যেগুলো খেয়ে আমরা জীবন কাটিয়েছি।

সাত দিন পর্যন্ত আমাদের মসজিদ মাদরাসার উপর গোলা-বারুদ এত বেশি এবং এত জোরে নিক্ষেপ করা হয়েছে যে, আমার এমন মনে হয় যেন এখনো তার আওয়াজ কানে বাজছে। আমি খুব অদ্ভুতভাবে শুনতে পাই। যখন ভূমিকম্পে ভীত মেয়েরা আমার কাছে এসেছিল তখন তাদের এমন অবস্থা ছিল। তারা বসতে বসতেও ভূমিকম্প ভূমিকম্প বলে চিৎকার দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইতো। আজ আমারও সেই অবস্থা অনুভব হচ্ছে। কেননা কখনো বসে বসে আমার এমন মনে হতো যেন ভারী অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করা হচ্ছে অথবা বোম্বিং শুরু হয়েছে।

হে আলোকিত সূর্য! এই সাক্ষী লিখে দাও
আজো অন্তরের ব্যথাগুলো দূর করতে চাই
বিগত দিনের সকল কিছু স্মরণ করে
শ্বাস নিতে গেলে বারুদের গন্ধ আসে।

গৌরবান্বিত শহীদদের প্রতি সালাম

আমার ওই সমস্ত পিতা-মাতা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠায় শহীদদের বংশধরদের প্রতি খুব ইর্ষা হয়, যাদের সন্তানরা হকের আওয়াজকে উঁচু করতে গিয়ে নিজেদের জান উৎসর্গ করে দিয়েছে। আমার আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের কতইনা ভালোবাসেন যাদের কলিজার টুকরোগুলো আল্লাহর নামে কুরবান হয়ে চলে গিয়েছে।

সাইয়িদা খানসা রা. এর মত জযবার অধিকারী এবং উঁচু হিম্মতের অধিকারী মায়েরা, যারা তাদের প্রিয় সন্তানের লাশের উপর ফুল দিয়ে তাদেরকে জান্নাতের পথে বিদায় জানিয়েছেন। নিশ্চয় সে সকল মায়েরা আমাদের

সকলের মা। আমাদের মর্যাদা, আমাদের গৌরব। ওই সমস্ত বোন যারা নিজেদের বীর বাহাদূর ভাইদের আলোকিত ললাটে চুমু দিয়ে আল্লাহ থেকে প্রতিদানের আশায় তাদেরকে আখেরাতের পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। তারাও ইর্ষার পাত্র। আল্লাহ তাআলা এসমস্ত শহীদদেরকে জান্নাত নসীব করুক। আমীন

শহীদরা কতইনা সম্মানিত। যাদের রক্ত থেকে, শরীরের টুকরা থেকে, কবরের মাটি থেকে বেহেশতের সুঘ্রাণ ছড়ায় এবং কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের আওয়াজ আসে। তারা উঁচু মর্যাদার অধিকারী যারা যুগের কারবালার মাটিকে নিজেদের পবিত্র রঙে রঞ্জিত করেছে। তারা পুরা জাতির পক্ষ থেকে ফরজে কেফায়া আদায় করেছে। এরপর মিছিল করতে করতে জান্নাতে চলে গিয়েছে। আমিও আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি। কারণ শহীদদের এই মিছিলে আমার একমাত্র প্রিয় সন্তান হাসসানও ছিল।

আনন্দের কথা হলো, এখন পর্যন্ত যে সমস্ত শহীদদের মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। সকলকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ পেয়েছি। আমরা সকলেই ওই সকল গৌরবান্বিত শহীদদের প্রতি জানাই সালাম ও বিনম্র শ্রদ্ধা। যারা আহলে হকের মান সম্মান সমুন্নত রেখেছে।

রক্তের বীজ বপন করে হাজারো বাগানের অধিকারী
কলিজার খুন নিংড়িয়ে নিজেদের প্রদিপ প্রজ্জলিতকারী
তোমাদের স্মরণ অন্তরে গেঁথে আছে হে পরপারের যাত্রী
তোমাদের প্রতি সালাম হে সম্মানিত রাহবার! মাথা বিসর্জনকারী।

লাল মসজিদ ট্রাজেডি পুরো জাতিকে শোকাহত করেছে

লাল মসজিদ ট্রাজেডি সত্যিই এমন একটি ঘটনা যা পুরো জাতীকে শোকাহত করেছে। কত চোখ রাতভর কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছে। কত অন্তর অধিক চিন্তার কারণে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যখন সাধারণ মুসলমানদের এই অবস্থা। তখন চিন্তা করুন এই ঘটনা আমাকে কেমন

ব্যথিত করেছে। আমাদের তো তিন প্রজন্ম দ্বীনের জন্য উৎসর্গ হয়ে গিয়েছে।

আমরা অল্প অল্প করে জাতির অসহায় অনাথ দরিদ্র মেয়েদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল বানিয়েছিলাম সেটাও তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। মাদরাসার একেকটা ইট মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে, যার একেক ইটের বিনিময়ে আমাদের কত কঠিন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও আমরা আল্লাহ তাআলার তাকদীর ও বন্টনের উপর সন্তুষ্ট এবং ধৈর্যের আঁচল টেনে ধরে তার থেকে প্রতিদানের আশা রাখি। শহীদদের অন্যান্য সকল আত্মীয় স্বজনদের প্রতি উদ্বাত্ত আহবান যেন তারাও ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে প্রতিদানের আশা করে।

সে সময় একটা প্রশ্ন সকলের অন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, এসকল মাযলুম, নির্দোষ জান্নাতী শাহজাদা এবং অবুঝ পরীদের রক্ত বৃথা চলে যাবে? না, আল্লাহর কসম না। এই রক্ত অবশ্যই তার রঙ পরিবর্তন করবে। এই রক্তের প্রভাব অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। এর ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে মূল প্রশ্ন এটি নয় যে, এই রক্তের ভবিষ্যত ফল কি হবে? বরং প্রশ্ন হলো এই রক্তের বদলা নিতে আমাদের কর্তব্য ও কর্ম পদ্ধতি কি হবে?

এসকল পবিত্র গুনাবলীর অধিকারী ফেরেশতার ন্যায় যুবকদের কুরবানী কিভাবে বৃথা যেতে পারে? যারা নিজেদের সকল স্বপ্ন ও আশা ভরসা বিসর্জন দিয়ে দ্বীনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন। তাদের কুরবানী পরিবেশ অনূকূলে করে দিয়েছে। এসময় আমাদের মাটি উর্বর। আহলে হকের স্মৃতি বিজড়িত কুরবানী হকের আওয়াজ উঁচু করে দিয়েছে। ওই সময় আমাদেরকে জান্নাতের মেহমান খানা থেকে শহীদের রুহ চিৎকার করে ডেকে বলছে, হে মুসলিম উম্মাহ আমাদের বার্তা এবং আমাদের মিশন ভুলে যেওনা। আমরা যে উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছি, সে উদ্দেশ্যে নিজের মন, মস্তিষ্ক, জীবন ও শরীর উৎসর্গ করে দাও।

শহীদেরা ডাকছে তোমায় জান্নাতের মেহমান খানায়
প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে মোরা বিলিয়ে এসেছি জীবন,
আর তুমি এখনো পড়ে আছো জীবনের মায়ায়।
পাও যদি মোর তাজা খুনের প্রবাহচিহ্ন, রঞ্জিত হওয়া পথে,
তবে থেমে যেয়োনা সেথায়, অগ্রসর হয়ে চলো সে পথে।

এই সময়ের সবচেয়ে বড় তাকাযা হলো এই যে, মানুষের অন্তর ইসলামী শাসনব্যবস্থার আওয়াজ শুনতে মুখিয়ে আছে। এ সুযোগে আমাদের সবচেয়ে বেশী এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত। যাতে ইসলামী শাসনব্যবস্থার আওয়াজ ঘরে ঘরে, দরজায় দরজায় ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পৌছে যায়।

যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম মসজিদের ইমাম ও খতীব হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তারা মিম্বার থেকে ওয়ারিসে আম্বিয়া তথা নবীর ওয়ারিশ হিসাবে তার দায়িত্ব আদায় করবেন। যারা লেখক তারা কলমের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন। যারা সাধারণ মানুষ তারা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের বন্ধু-বান্ধবের মাঝে মেজাজ পরিবর্তনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দাওয়াত চালু রাখবে।

সমালোচনা নয় পর্যালোচনা

এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা দেখছিলেন এবং সকলে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা এ বিষয়টি আল্লাহ তাআলার নিকট ন্যাস্ত করছি। কিন্তু স্মরণ রাখুন, এখন এই আলোচনা করে কোন ফায়দা নেই যে, অমুক এমন করেছে, অমুকের এটা করার দরকার ছিল, অমুকের এভাবে করা উচিৎ ছিল। বরং সবচেয়ে অধিক চিন্তার বিষয় হলো এই যে, সকলেই নিজের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করুন, আমি কি করেছি। আমার কি করার দরকার ছিল, এখন আমি কি করতে পারি। সাঁপ চলে যাওয়ার পর লাঠি নিয়ে মারার

ফায়দা তো জানা আছে যে, কোন ফায়দা নেই। তারপরেও আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের অতীতের ভুলগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের অনুসরণের পথেই সফলতা ও কামিয়াবী অর্জন করে।

লাল মসজিদের শহীদরা এইজন্য কুরবানী করেনি যে, আমরা নিজেদের মাঝে সর্বদা ঝগড়া আর ঘেউ ঘেউ ও মেঁ, মেঁ করব। বরং তাদের কুরবানী অনেকগুলো ভুল বুঝাবুঝির সমাধান করেছে। প্রপাগাণ্ডা নস্যাৎ করেছে। লাল মসজিদের ঘটনার পূর্বে যে সকল ভুল বোঝাবোঝি কিংবা সন্দেহ ছিল, এখন তা দূর হয়ে গিয়েছে। যে সকল মানুষের গতকালকেও লাল মসজিদের বার্তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল আজ তাদের সামনে সকল কিছু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এজন্য আমি হাজার হাজার হাফেজ তালেবুল ইলম ও তালিবাদের পক্ষ থেকে মুহাব্বাতের সাথে আরজ করছি যে, আমাদেরকে আজ থেকে লাল মসজিদের শহীদদের পয়গাম ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের মিশন সফল করতে একত্রিত হয়ে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা করতে হবে। আমরা আমাদের শক্তি -সামর্থ, পরস্পর মতবিরোধ ও মতানৈক্যের মধ্যে সময় নষ্ট না করে ঐক্য গড়ে তুলে মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হবেন, ইনশাআল্লাহ!

জামিয়া হাফসা শহীদ করে দেয়া হয়েছে তো কি হয়েছে মাদরাসা তো আর ঘর-দরজার নাম না। বরং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা তো গাছের নিচে বসেও চালু রাখা যায়। এজন্য জরুরী বিষয় হলো, জায়গায় জায়গায়, অলিতে গলিতে ও গ্রামে গঞ্জে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদআত ও শরীয়া বিরোধী কর্মকাণ্ড যেখানেই হবে সেখানেই তা ধ্বংস করে নিষ্ঠার সাথে ইলমের নূরে নূরান্বিত করা। কেননা রাতের অন্ধকারের অভিযোগ করা থেকে উত্তম হলো নিজের অংশে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে নেয়া।

আলহামদুলিল্লাহ! এখন বড় বড় উলামায়ে কেরামের অধীনে এবং তাদের নেতৃত্বে "তাহরীকে ত্বলাবা ও ত্বলাবাত বরায়ে নেফাযে ইসলাম" এর প্ল্যাটফর্ম থেকে নতুন নতুন দৃঢ় সংকল্প ও উদ্দীপনা এবং উদ্যমতার সাথে

আবেগ ও আকাঙ্খা নিয়ে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নে বায়আত নেয়া হচ্ছে। এই বরকতপূর্ণ কাজে নারী-পুরুষ সকলেই স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেছে। সাড়ে ছয় লক্ষ পাকিস্তানী শহীদের দাওয়াত এবং নেফাযে ইসলামের হাজারো শহীদের পবিত্র রক্তের ঘ্রাণ আপনাকে ডেকে ডেকে বলছে, হে পবিত্র ভূমির অধিবাসী! "তাহরীকে ত্বলাবা ও ত্বলাবাত বরায়ে নেফাযে ইসলাম" এর সাথে যোগ দাও।

(জামিয়া হাফসার ছাত্রী ও শিক্ষকদের মুখে সেই ট্রাজেডির বর্ণনা)

হয়ত চাদর নয়ত কাফন

বিনতে বেলাল কুরাইশী
জামিয়া হাফসা ইসলামাবাদ

সবশেষে কয়েকজন ছাত্রীর জীবনী এবং তাদের পরিস্থিতি ও অনুভূতির কথা বর্ণনা করছি। এটি মাত্র দুই চারজন ছাত্রীর ঘটনা। নতুবা বহু ছাত্রী নিজেদের দুঃখ ও কষ্টের ভয়ানক গল্প চিরদিনের জন্য নিজের কাছেই স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছে। নির্যাতন ও নিপীড়নের বহু ঘটনা জামিয়া হাফসার ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে গেছে। নিজেদের নির্যাতনের প্রমাণ মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টাকারীরা জানিনা কিভাবে ভুলে গিয়েছে।

হে বন্ধুরা! হাশরের দিন তো নিকটেই, রক্তের পেয়ালা লুকাবে কিভাবে?
খঞ্জরের মুখ যখন থাকবে চুপ, রক্ত তখন বলবে হাত কার?

জানিনা ছাত্রীরা কত স্বপ্ন সাজিয়ে ছিল। কাকে কাকে দাওয়াত দিবে। কত জোড়া জামা সেলাই করবে। জুতা তো প্রথমেই নিয়ে রেখেছে। আমি তো এটি ভেবেই আনন্দ অনুভব করছিলাম যে, ভাইজান কতইনা খুশি হবেন। আব্বুর থেকে পুরষ্কার নিব। আম্মিজানকে চাদর পরানোর সময় ডাকবো। সখীদের দাওয়াত দিব। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। আর চোখের

শুরমা অশ্রু হয়ে ভেসে গেল। বিগত চার বছর যাবত যখনই খতমে বোখারী এবং চাদর পরানোর অনুষ্ঠানের সময় হতো তখন আমি সেই সুন্দর কল্পনায় হারিয়ে যেতাম যে, আমি কবে আমি এই পর্যন্ত পৌছবো? কবে আমার উপর ফুলের পাপড়ি ছিটানো হবে? আর সেদিন কবে আসবে? যেদিন আমার চারপাশে মোবারকবাদের শ্লোগান তোলা হবে।

কিন্তু আফসোস! খুশির সেই সময় যখন আসলো, তখন জানিনা কি কি বিভিষিকাময় অবস্থা (কেয়ামত) নিয়ে এসেছে। আমি সেদিনের কথা কখনো ভুলতে পারবোনা। যখন জামিয়া হাফসায় চাদর পরানোর বিপরীতে কাফন পরানো হয়েছিল। জামিয়া হাফসার দরজা-জানালা ফুল দিয়ে সাজানোর পরিবর্তে রক্ত দিয়ে গোসল দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে কিতাবের পরিবর্তে লাশ পুরষ্কার দেয়া হয়েছে। ফুলের পরিবর্তে গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বোনদের লাশের টুকরা খুজে জমা করতে হয়েছে।

আমাদের প্রিয় উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব। যিনি আমাদেরকে চাদর পরানোর কথা ছিল, তার মাথা থেকে পাগড়ী খুলে ফেলা হয়েছে এবং গাজী সাহেব, যিনি আমাদের ছোট ছোট আনন্দের বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতেন। তিনি খতমে বুখারী ও চাদর পরিধানের সময় তো এমন গুরুত্ব দিতেন, যেন সেই একদিনেই তার ঘর থেকে তার মেয়েদের পাল্কী উঠানো হবে। এই বৎসর কি বিদায়ী অনুষ্ঠান হবে? গাজী সাহেব যেখানে ষ্টেজ সাজাতেন সেখানে নিজের মেয়েদের লাশ নিজ হাতে দাফন করছেন।

ভেবে দেখেছ? আল্লাহ তাআলা তার এই প্রিয় বান্দাকে কেমন সাহস দিয়েছেন। যেখানে মানুষ এক মেয়ের মৃত্যুতেই বেহুশ হয়ে যায় সেখানে গাজী সাহেব তার ২০ মেয়ের লাশ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। হয়ত তাকে এত হিম্মত ও সাহস এই জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তিনিও হয়ত তার মেয়েদের সাথে জান্নাতে যাবেন। না হয় আল্লাহর কসম! তাঁর সামনে যা হয়েছে তা যদি অন্য কোন বাবার সামনে হতো তাহলে কলিজা ফেটে যেত।

আর আপুজানের নরম মিষ্টি মধুর ভাষা এবং তার স্নেহ ও মমতার কোল আমার মত শত শত মেয়ের আশ্রয়স্থল ছিল। তিনিও ধৈর্যের সর্বোত্তম পরিক্ষা দিয়েছেন।

আহ! আমার বান্ধবী সাজিয়া, যে পুরষ্কার পাওয়ার কথা ছিল.....। সায়েমা বলছিল যে, তার চাচা তাকে খতমে বুখারীতে সোনার অলংকার বানিয়ে দিবে....। বেচারী কিরণ.... আমার বান্ধুবী, যে নাকি বাড়ি দূরে হওয়ায় বছরে মাত্র একবার বাড়িতে যেত এবং হতদরিদ্র পরিবারে সন্তান ছিল। তিন মাস পূর্বে তার ভাই তার জন্য লিলেনের একসেট জামা বানিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। সবাই তাকে অনেকবার বলেছে যে, বিয়ের সময় নতুন জামা পাবে, এগুলো এখন পরিধান করে ফেল। কিন্তু সে এগুলো ব্যবহার না করে নিজের আলমারীর মধ্যে হেফাজত করে রেখে দিয়েছে। সে বলত, আমি তো এই জামা খতমে বুখারী আর চাদর পরিধানের অনুষ্ঠানে পরবো। আমাদের জোরাজোরি করা সত্ত্বেও সে এই জামা পরেনি। মাঝে মাঝে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তার এই জামা বের করত এবং তার উপর হাত বুলাতো আর তা দেখে দেখে আনন্দিত হতো। খতমে বুখারীর দিন যতই নিকটবর্তী হচ্ছে সে ততই খুশিতে আত্মহারা হচ্ছে। হয়ত তার কাছে এই খতমে বুখারীর আনন্দ আর লিলেনের জামার আনন্দ সমান ছিল।

আমরা রাত দিন এক করে হাদীসের বড় বড় কিতাবাদী শেষ করার প্রচেষ্টায় ছিলাম। যাতে দ্রুত শেষ হয়ে যায় আর খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান হয়ে যায়। কিন্তু হায় আফসোস! খতমে বুখারীর পরিবর্তে জামিয়া হাফসা খতম হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে গেল। খুনীদের অপারেশন আমাদের সকল আশা ভরসা খুন করে দিয়েছে। আমাদের সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমাদের সকল আনন্দ মাটি হয়ে গেল। গুলির আওয়াজ এবং বোমার আঘাতে আমাদের বোনদের শরীর খন্ড বিখন্ড হয়ে উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের সকল পরিকল্পনা ধূলায় মিশে গেল।

যে জামিয়া হাফসায় দিন রাত ক্বালাল্লাহু, ক্বালা রাসূলের আওয়াজ গুনগুন করত। যেখানে খুশি ও আনন্দের পরিবেশ ছিল। সেখানে ভয় ও উৎকণ্ঠা বাসা বেধে নিয়েছে। প্রতিটি মূহুর্তে আমরা মৃত্যুকে অতি নিকটে দেখেছি।

হত্যাকাণ্ডের তৃতীয় দিন। আমরা ৫বান্ধবী জামিয়ার এক কামরায় চুপিসারে বসেছিলাম। আর সর্বদা যিকির আযকার পাঠ করছিলাম। জীবিত থাকার কোন আশায় দেখছিনা। আমরা নিজ নিজ কিতাবাদী বেঁধে আলমারীতে রেখে দিয়েছি। সালমার দৃষ্টি কিরণের জামার উপর গিয়ে পড়ল। সে কিরণে কাঁধে হাত রেখে শেষবারের মত তাকে জোর করে বলল, তুমি এই জামা পরিধান করো। হয়ত তারও বিশ্বাস হতে চলেছে যে, এখন আর আমাদের খতমে বুখারী হবেনা। অথবা আমরা নিজেরাই থাকবোনা। সে অভিমানী মেয়ে অত্যন্ত সহজেই মেনে নিল। আমার বুঝে আসছিলনা যে, কিরণকে নতুন জামা পরিধান করায় বাহবা দিব নাকি তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করব। কিরণকে ওই পোশাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। আমার তো স্পষ্ট খেয়াল আসছে যে, হয়ত তার দিকে আমার দৃষ্টি আটকে গিয়েছে। নতুন পোষাক পরিধান করেছে যে বেশি সময় হয়নি, এর মাঝে নামাযের সময় হয়েছে।

কিরণ বারান্দায় রাখা বালতি থেকে পানি নিতে গিয়ে আমাদের থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে। একটি গুলি এসে তাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। কিরণের নিস্তেজ দেহ বারান্দায় পড়েছিল। আমরা চার বান্ধবি তাকে রুমের ভিতর নিয়ে এসেছি। আমরা খুব অসহায় ছিলাম। আমাদের কাছে কিরণের ক্ষতস্থানে দেয়ার মত না মলম ছিল, না তা বন্ধ করার মত কিছু ছিল। মারিয়া তার ব্যানিটি ব্যাগ থেকে রাবার (কাপড়ের টুকরা) বের করল। মায়মূনা পানির পাত্র উঠিয়ে কিরণের মুখের কাছে নিল। কিন্তু কিরণে পানির কোন প্রয়োজন হয়নি। সে তো শাহাদাতের অমৃত সূধা পান করে নিয়েছে। আমরা অনেক্ষণ তার দিকে আফসোস ও অসহায়ত্বের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। খুব কেঁদে ছিলাম। নতুন পোশাকে কিরণের নিপীড়িত হওয়ার দৃশ্য দেখতে কষ্ট হচ্ছিল। মারিয়া তার আলমারী থেকে বড় একটি চাদর বের করে কিরণের গায়ে বিছিয়ে দিয়েছে।

আপুজান আমাদেরকে প্রথম থেকেই বলছিলেন যে, তোমরা বাহিরে চলে যাও। কিন্তু আমরা তাকে উত্তর দিয়েছি যে, আমরা মাদরাসায় আপনাদের সাথে শাহাদাতের সূধা পান করতে আগ্রহী। কিন্তু কিরণের শাহাদাতের পর আপুজান দুজন বড় আপুদেরকে আমাদের কামরায় পাঠিয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমরা বড় আপুদের সাথে চলে যাই। অতঃপর আমরা বাধ্য হয়ে বের হয়ে গেলাম।

এখনো বারবার কিরণের দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠে। যে দিনগুলোতে সকল মাদরাসায় খতমে বুখারী এবং চাদর পরানোর অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিদায়ী ছাত্রীরা আনন্দ করছে। আমরা সেদিনগুলোতে চিন্তা পেরেশানীতে আর দুঃখে কষ্টে আফসোস করে ভাবতাম, হায় যদি আমাদেরও কিরণের মত চাদর পরানো হতো!

আমাদের উপর যা ঘটেছিল
জামিয়া হাফসার ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ

লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসায় অপারেশন সাইন্সলেইন্স চলাকালীন জামিয়ার শিক্ষিকা, ছাত্রী ও ছাত্ররা জানিয়েছে যে, অনেক ছাত্রী সময়মত হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারায় এবং চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় শাহাদাত বরণ করেছে। পুলিশ এবং এজেন্সীর অফিসাররা হাসপাতাল থেকে আহত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। একটি জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে বিশেষ সাক্ষাতকার দেয়া ফাতিমা নামের এক ছাত্রী জানিয়েছিল যে, সে আলিয়া জামাতে পড়ত এবং রাউলপেন্ডির বাসিন্দা ছিল। সে ৮তারিখ পর্যন্ত জামিয়া হাফসায় অবস্থান করেছিল। সে সময় সে শুকনো রুটি পানির মধ্যে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেত।

সে বলল, সে সেহরীর সময় শুকনো রুটি পানি দিয়ে খেয়ে সারাদিন রোযা রাখতো। মাগরিবের আযানের সময় পানি অথবা রুটি বা যা পেত তা দিয়ে ইফতার করত।

ফাতিমা আরো বলেছে, আমাদের নিকট কিছু পানি ছিল। আমরা খুব সতর্কতার সাথে তা ব্যবহার করতাম। আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা যত বেশি পানি জমিয়ে রাখতে পারি। যাতে প্রয়োজনের সময় আহত অথবা দুর্বল ছাত্রীদের কাজে আসে। এরপর এমন হয়েছে যে, অপারেশনের ৪র্থ দিন জুমার রাত প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে মুষলধারে বৃষ্টি হলো। এতে আমরা অনেক পানি জমা করেছি এবং তা পান করেছি।

আমাদের বহু বান্ধবী আমাদের চোখের সামনের রক্তাক্ত হয়ে ছটপট করতেছিল। আমরা অনেক কষ্টে তাদের নিকট পৌছে তাদেরকে পানি পান করিয়েছি এবং তাদের জখমের স্থানে নিজেদের ওড়না ছিড়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি।

কিন্তু আমাদের সামান্য এই চিকিৎসা তাদের ব্যাথা কোন ভাবেই কমাতে পারেনি। কাউকে তো অধিক ফায়ারিং এর কারণে হাসপাতাল পর্যন্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। সে চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে এবং অধিক রক্তক্ষরণে আমাদের চোখের সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

ফাতেমা জানিয়েছে যে, হামলার প্রথমদিন আমার বাড়ি থেকে আমার মা, আমার ভাই আমাকে নিতে এসেছে। কিন্তু আমি বলেছি, আমি আমার বান্ধবী এবং আমার শিক্ষিকাদেরকে এভাবে মসীবতের মাঝে একা ছেড়ে কখনো যাবোনা। হয়ত আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিজয় দান করবেন অথবা আমি আমার বান্ধবী ও শিক্ষিকাদের সাথে এখানেই শহীদ হয়ে যাবো। আমার মা আমার জন্য অনুনয় বিনয় করেছেন। মান্নত করেছেন। আমার ভাইও আমাকে অনেকভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি বলেছি, আপনারা বাড়িতে চলে যান। আর আমাদের জন্য দুআ করুন। এরপর আমার মা আর ভাই সেখান থেকে কান্না করতে করতে চলে গেলেন।

তখন কিছু ছাত্রী নিজেদের পিতা-মাতার জোরাজোরিতে কেঁদে কেঁদে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে চলে গিয়েছে। জামিয়া হাফসায় তৃতীয় দিন পর্যন্ত ১০০ ছাত্রী শাহাদাত বরণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই লাশগুলো থেকে এক অদ্ভুত ও বিমোহীত ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছিল।

৮ তারিখ যখন টিয়ারশেল নিক্ষেপ করছিল। তখন আমাদের কামরায় গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বের হতেও পারছিনা, কারণ যে কোনো দিক থেকেই গুলি আসতে পারে। এরপর এমন হয়েছে যে, চোখের যন্ত্রণায় এবং শ্বাস কষ্টে আমার মস্তিষ্ক বিগড়ে যাচ্ছিল। এরপর আমি বেহুশ হয়ে যাওয়ায় আর কিছু বলতে পারবোনা। যখন হুশ ফিরল, তখন আমি কমপ্লেক্স হাসপাতালে ছিলাম যেখানে চতুর্দিকে আহত এবং বেহুশ ছাত্রীরা পড়েছিল। আমাদের ৫ জন ছাত্রীকে এম্বুলেন্সে করে হাজীক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখান থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরের দিন বাবা মায়ের কাছে হস্তান্তর করল।

সাম্বুল নামের এক ছাত্রী বলল যে, আমি জামিয়া হাফসায় দুই বছর যাবত পড়া লেখা করছি। আমাদের শিক্ষিকারা বিশেষ করে আপুজান (উম্মে হাসসান) সকল ছাত্রীদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ভালোবাসতেন। ছাত্রীরা শিক্ষিকাদেরকে এবং উম্মে হাসসানকে নিজেদের পরিবারের মত মনে করত।

সাম্বুল বলল, প্রথম দিন অনেক টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। তখন আমরা বালতি ভরে ভরে পানি এনে আহত ছাত্রীদেরকে কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে দিতাম। সাথে লবন দিতাম। টিয়ারশেলের গ্যাসে আহত ছাত্রীদেরকে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেয়ার সময় রাস্তার মোড়ে দাড়ানো পুলিশ অফিসাররা এম্বুলেন্স থামিয়ে ছাত্রীদেরকে গ্রেফতার করত। এভাবে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ফিরে আসার সময়ও ছাত্রীদেরকে পুলিশ পাকড়াও করত।

জামিয়া হাফসার একজন শিক্ষিকা রায়হানা জানিয়েছেন, যখন আক্রমন শুরু হয়েছে তখন ঘটনাক্রমে আমি ঘরে ছিলাম। আমাকে দুপুর একটার সময় আমার বোন ফোন করে আক্রমন শুরু হওয়ার কথা জানিয়েছে। আমি আমার সন্তানদেরকে প্রতিবেশীর কাছে রেখে আমার স্বামীর সাথে জামিয়া হাফসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি। তখনও ফায়ারিং চলতেছিল। আমি পিছনের রাস্তা দিয়ে যখন জামিয়ায় প্রবেশ করেছি তখন টিয়ারশেলের কারণে ছাত্রীদেরকে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতে দেখলাম। আর শিক্ষিরা তাদের তুলে তুলে এম্বুলেন্স

পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছে। আমিও ছাত্রীদেরকে গাড়িতে তুললাম এবং অন্যান্য শিক্ষিকাদের সাথে হাসপাতালের দিকে রওয়ানা দিলাম। আমাদেরকে হাসপাতালের মহিলা ডাক্তাররা বলল যে, এখানে আসা আহত ছাত্রীদেরকে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আপনারা যদি আপনাদের বোরকা খুলে চাদর দিয়ে নেকাব বেধে পেলেন। তাহলে তারা আপনাদেরকে চিনবেনা। তারা আমাদেরকে এক কামরায় নিয়ে গেল। যেখানে আমরা আমাদের পরিচয় (বোরকা) পরিবর্তন করেছি এবং চাদর দিয়ে নেকাব বেঁধে নিয়েছি।

আমাদের সাথে কাশ্মীরের একজন শিক্ষিকা ছিলেন। যিনি আসার সময় নিজের দুইটি ছোট বাচ্ছাকে নিয়ে এসে ছিলেন। যখন পুলিশের সদস্যরা এক আহত তালিবুল ইলমকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি পুলিশের সামনে দুই হাত জোড় করে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে এই আহত তালিবুল ইলমকে গ্রেফতার করোনা। পুলিশ যখন জোর করে নিয়ে যেতে চাইলো তখন তিনি পুনরায় হাত জোড় করে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার এই দুই মাসুম বাচ্ছাদেরকে নিয়ে যাও। তারপরেও আহত এই ছাত্রকে গ্রেফতার করোনা। কিন্তু পুলিশ তার কোন কথা শুনেনি, বরং ওই তালিবুল ইলমকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

এরপর পুলিশ ওই শিক্ষিকাকেও তার মাসুম বাচ্চাসহ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আমি পোশাক পরিবর্তন করে নেয়ায় তারা আর আমাকে গ্রেফতার করেনি। পরবর্তীতে আমার সাথে থাকা দুইজন ছাত্রীকে আমার সাথে করে বাড়িতে নিয়ে গেছি। তারপর সেখান থেকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি।

ওসিয়তনামা

জামিয়া হাফসার ছাত্রীরা শেষ দিনগুলোতে নিজেদের পরিবারের নিকট যে ওসিয়ত লিখেছিল তার মধ্যে কয়েকটি আপনাদের হাতে পৌছেছে। বাকী আরো হাজার হাজার ওসিয়ত ছুটে যাওয়া ঘুড়ির ন্যায় এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। খড়কুটার সাথে ড্রেনে চলে গেছে। ছাত্রীদের আলমারী ও ব্যাগের ভিতরে রয়ে গেছে। ওই সকল ওসিয়তগুলোর মধ্যে এখানে শুধুমাত্র দুটি ওসিয়ত উল্লেখ করছি। এই ওসিয়তনামার মধ্যে ছাত্রীদের ঈমানী জজবা, তাদের চিন্তা ফিকির প্রকাশ পায় এবং ঈমান নবায়ন হয়।

এই ওসিয়ত ফিকিরের আহবান ও আমলের পয়গাম।

জামিয়ার ছাত্রী রাশিদার ওসিয়ত

প্রিয় বাবা-মা!

যখন আপনারা আমার এই চিঠি পড়বেন, জানিনা তখন আমি কোথায় থাকবো। হয়ত আসমানে। হয়ত সুভাসিত আকাশে অথবা আপনাদের আশপাশে কোথাও। আমি জানি যে, আপনি আপনার প্রিয় মেয়ের ওসিয়তনামা পড়ছেন। আপনার জন্য অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু আপনার জন্য এই সৌভাগ্য কম কিসের যে, আপনাদের তাকদীরে এটা লেখা ছিল যে, আপনাদের শহীদ হাফেজার মাতা পিতা বলা হবে।

আব্বু! আমি আপনাকে ওসিয়ত করতে চাচ্ছি যে, আপনি আমার বিয়ের জন্য যে টাকা জমিয়ে রেখেছেন তা দিয়ে আম্মার চোখের অপারেশন করাবেন এবং আপনিও অনুগ্রহ করে আপনার হাটুর চিকিৎসা করাবেন। তারপর যদি কিছু টাকা বেচে যায়, তাহলে তা দিয়ে ভাইকে একটা দোকান নিয়ে দিবেন, যাতে সংসারের খরচ চালাতে পারে।

আম্মু! আপনি আমার বিয়ের জন্য যে জামা বানিয়েছেন তা গরিবদের দিয়ে দিবেন। তাদের বাচ্চাদেরও আমাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে। তাতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহম অনেক খুশি হবেন। তাহলে আমার আত্মাও অনেক আনন্দিত হবে।

ভাইয়া! আপনার কাছে আমার শেষ আবদার। আপনি নামাযের গুরুত্ব দিবেন। তাতে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবেন।

প্রিয় আব্বু! সকল কথা আমি এখন বলবোনা। কারণ সময় খুব কম। এই কথাগুলোই বলা জরুরী ছিল। কেননা আমি আপনাদের উভয়ের এবং ভাইয়ার কোন খেদমত করতে পারিনি। এজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আমি আপনাদের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ঘরে ফিরে যায়নি। এজন্যও মাফ করে দিবেন। এই জামিয়া হাফসাও তো আমার ঘর। যেখানে আপনি নিজেই আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন।

এখানে যে গুরুতর অবস্থা। তাতে আমরা অনেক বিপদে আছি। কিন্তু পিছিয়ে আসছিনা, কারণ এখানে আমাদের কোন অপরাধ নেই।

অবশেষে আপনাদের তিনজনকে সালাম জানাই। আপনারা অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে সুখে রাখুন। আম্মু! প্লিজ আপনি আমার জন্য কান্না করবেন না।

সালামান্তে
আপনাদের রাশিদা

সায়েরা আব্দুল করীমের ওসিয়ত

প্রিয় আম্মু, আব্বু, আযহার ভাইয়া, মাযহার ভাই ও মিসবাহ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

আমি বলতে চাই যে, আপনারা জানেন যে, মৃত্যু সত্য। আমাকে, আপনাকে, আমাদের সকলকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাহলে আমরা ভালো মৃত্যু বরণ করি। ভালো মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু। আর শাহাদাতের মৃত্যু যার নসীব হয়, সে সব সময়ের জন্য জীবিত হয়ে যায়। এটা এমন এক মৃত্যু যে, শহীদ কেয়ামতের দিন বলবে, হায়! যদি আমি আরেকবার জীবিত হয়ে আবার শাহাদাত বরণ করতাম।

আপনাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা আখেরাতে গর্ববোধ করবেন। কেননা আখেরাতে শহীদের বাবা-মাকে এমন একটা মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে অধিক হবে। আর শহীদের জন্য আখেরাতে একটি উচু মর্যাদা হবে।

আম্মু! আপনি আর আব্বু জানেন, আমাদের দাবী খুব বেশি কঠিনও না এবং না জায়েযও না। আমরা চাই যে, আমাদের দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হোক। এই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের জান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পেশ করছি। আমাদেরকে কেউ বাধ্য করেনি। আপনারা এমনটি মনে করবেন না যে, আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের ভাইয়েরা যখন ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে পারেনি তাই আমরা চিন্তা করেছি আমাদেরকেই কিছু করতে হবে।

এজন্য আব্বু, আম্মু, মাযহার ভাই, আযহার ভাই এবং আমার বোন মিসবাহ! আপনাদের সকলের নিকট আমি দোয়া চাই। আমার শাহাদাতের পর কেউ কান্না করবেন না, বরং আপনারা গর্ববোধ করবেন যে, আমাদের মেয়ে শাহাদাত লাভ করেছে। কাউকে বিলাপ করতে দিবেন না। এজন্য যে, এতে মৃত ব্যক্তির শরীর কষ্ট পায়। জান্নাত সুস্বাদু। আপনারাও তার স্বাদ গ্রহন করবেন। মিসবাহকে অনেক অনেক সালাম। আমার প্রিয় বোন জীবনে সর্বদা জিহাদ করা শিখ।

আমি আমার সকল আত্মীয়-স্বজনের নিকট আবেদন করছি যে, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। মানুষ থেকে অনেক ভুল হয়। যদি আমি কোন ভুল করে থাকি তাহলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি আমি কারো ঋণী হয়ে

থাকি তাহলে আমার আব্বু ,আম্মু থেকে নিয়ে নিবেন। কারো দিলে যদি আমার কারণে কষ্ট থাকে তাহলে প্লিজ সেটা ক্ষমা করে দিবেন।

আম্মু! আব্বু! যদি আমি ছাত্রীদের কাছে ঋণী থাকি তাহলে আপনারা তা দিয়ে দিবেন। আর আমার যত জামা-কাপড় রয়েছে। সকল কিছু গরীবদেরকে দিয়ে দিবেন।

বড় ভাইয়ার কাছে আবেদন এই যে, আপনি হাফেজ। আপনি আমার জন্য কুরআনুল কারীমের খতম অবশ্যই পড়াবেন। আর আপনিও দ্বীনের আওয়াজকে উচু করার জন্য এই পথে অবশ্যই বের হবেন।

আর সকলের নিকট আবেদন করছি যে, সকলেই নামাযের গুরুত্ব দিবেন। তাসবীহাতের গুরুত্ব দিবেন। সকাল সন্ধ্যার তাসবীহাত আদায় করে আমার জন্য দোয়া করবেন। আমালের খুব গুরুত্ব দিবেন, কেননা এই আমলই আখেরাতে কাজে আসবে।

আমি আম্মু এবং মিসবাহকে বলছি, আপনারা শরয়ী পর্দা শুরু করুন। এতে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয় তাহলে হোক। মিসবাহ তুমি তোমার কুরআন কারীম অবশ্যই পুরা করবে। আর আমার ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে অবশ্যই পড়বে।

আযহার ভাই! আপনিও নামাযের ইতহিমাম করুন। আম্মু আব্বুর কথা মেনে চলবেন। আর মিসবাহকে বকাঝকা করবেন না।

সালামান্তে
আপনাদের মেয়ে সায়েরা আব্দুল করীম
দাওরায়ে হাদীস, জামিয়া হাফসা, ইসলামাবাদ

আমি যখন মেয়েদেরকে উৎসাহিত করতে এই কথা বললাম যে, আমরা এই মূহুর্তে পরীক্ষায় পতিত হয়েছি। আর আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন।

আমার এই কথা শুনে ইবতিদাইয়া স্তরের একটি ছোট ছাত্রী সানিয়া বারবার আমাকে বলছিল যে, আমার এই কথা বিশ্বাস হচ্ছেনা যে, আমরা আল্লাহ তাআলার খুব নিকটবর্তী। আল্লাহ আমাদের খুব ভালোবাসেন। যদি আল্লাহ আমাদের এতই ভালোবাসেন তাহলে জুলুম ও নির্যাতনের এত বড় পাহাড় কেন আমাদের উপর ভেঙ্গে পড়লো। আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার বিশ্বাসই হচ্ছেনা। ইতিমধ্যে মাগরিবের সময় জামিয়া হাফসার বারান্দায় বৃষ্টির পানি রাখা বালতি গুলো থেকে সে পানি আনতে গেল। আমি বললাম, হে আমার মেয়ে সানিয়া! তায়াম্মুম করে নামায পড়। পানি পূর্ব থেকেই কম। কিন্তু সে তো সেই মহা জগতের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বালতি থেকে পানি নিয়ে অযু করল। অযু শেষ করে যখনই সে দাঁড়িয়ে ছোট্ট আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ছিল তখনই একটি গুলি এসে তার কণ্ঠনালীকে ছিদ্র করে বের হয়ে গেল। সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে গেল। আমি দৌড়ে এসে তাকে উঠাতে গেলাম, তখন সে আমার দিকে তাকিয়ে জোরে হাসা শুরু করল। আর বলল, আপুজান! আপনি সঠিক বলেছেন। বাস্তবেই আল্লাহ আমাদের অনেক ভালোবাসেন। এরপর সে চিরদিনের জন্য চপ হয়ে গেল।

প্রকাশনায়
মাকতাবতুল ইরশাদ
("মারকাযুস সুন্নাহ ওয়ালইরশাদ"এর প্রকাশনা বিভাগ)
নোয়াগাঁও চৌমুহনী, জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা।
যোগাযোগ: ০১৮৮০১০৮০০৬